কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

তিন নম্বর চোখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তিন নম্বর চোখ

এবার পুজোর ছুটিতে সুজয় তার বাড়ির সকলের সঙ্গে জলগাঁও বেড়াতে গিয়েছিল। জলগাঁও-তে ওর মামা চাকরি করেন। স্টেশনের কাছেই তার বাড়ি, খুব সুন্দর বাড়িটা। সব দেওয়ালের রং সাদা, আর দরজা-জানলাগুলোর রং ফিকে নীল,বাড়ির সামনে বাগান। গেটের দু-পাশে ঠিক দারোয়ানের মতো দুটো বড়-বড় গুলমোহর গাছ। সোনালি রঙের অজস্র ফুল ফুটে থাকে তাতে।

সুজয় প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতেই বেড়াতে যায়। সুজয়ের বাবা তো রেলে কাজ করেন, তাই বেড়াতে বেরুলে ওদের রেলের টিকিটের পয়সা লাগে না। সুজয়ের বাবার কাছে পাশ থাকে-সেই পাশ নিয়ে ওরা যতদূর ইচ্ছে যেতে পারে। সেই জন্যই খুব দূরে-দূরে বেড়াতে যায় ওরা। দিল্লি গেছে, দার্জিলিং গেছে, হায়দ্রাবাদে গেছে। সব বারই খুব মজা হয়। কিন্তু এবার যা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল, সেরকম আর কখনও হয়নি। তারপর থেকে সুজয়ের জীবনটাই বদলে গেল।

জলগাঁও জায়গাটাতে এমনিতে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু মামাবাড়ির বাগানটাতে ছুটোছুটি করতেই খুব ভালো লাগে। তাছাড়া তার দুই মামাতো ভাই রাণা আর খোকনের সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হল। রাণা আর খোকনের সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছিল সেই চার বছর আগে, বড়দির বিয়ের সময়।

সুজয়ের নিজের কোনও ভাই নেই। বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। ছোড়দির সঙ্গে আগে সুজয়ের খুব ভাব ছিল, কিন্তু ছোড়দি কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে সুজয়ের সঙ্গে আর কানামাছিও খেলে না, ক্যারামও খেলতে চায় না। এবার বেড়াতে এসে সুজয় তার খেলার সঙ্গী পেয়েছে। রাণা সুজয়ের সমান বয়েসি, আর খোকন ওদের চেয়ে দেড় বছরের ছোট। খোকনের বয়েস এখন এগারো।

অবশ্য রাণা আর খোকনও অনেকটা বদলে গেছে। ওরা নাগপুরে সাহেবি স্কুলে পড়ে। সেখানকার ছাত্রাবাসেই থাকে-ছুটির সময় শুধু বাড়িতে আসে মা-বাবার কাছে। ওরা একদম বাংলা বই পড়ে না। খোকন তো বাংলায় কথা বলতেও অনেকটা ভুলে গেছে।

ওরা মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের গল্প জানে না, দুর্যোধন কেন কৃষ্ণকে নিজের দলে নিতে পারেনি-সেই গল্প জানে না, হনুমান আর লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিল তাও বলতে পারে না। সুজয় যখন খেলতে-খেলতে এই সব গল্প বলে-তখন ওরা কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু ওরা দুজনেই ক্রিকেট খুব ভালো খেলে। খোকন এমন গুগলি বল দেয় যে, মনে হয় বড় হয়ে নির্ঘাত চন্দ্রশেখর হবে।

সারাদিন ক্রিকেট খেলা আর ছুটোছুটি আর হাসাহাসি। এর নাম ছুটি। কলকাতা থেকে কতদূরে এই জলগাঁও, এখানে জীবনটাই মনে হয় অন্যরকম।

সুজয়ের একটা এয়ার গান আছে। কাকাবাবু আগের বছরের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতায় সুজয় সেই বন্দুকটা ব্যবহার করতেই পারেনি। কলকাতায় বাগান নেই, ফাঁকা জায়গা নেই। পার্কেও এত মানুষ-জন থাকে যে কখন কার গায়ে যে লাগবে, তার ঠিক নেই। সুজয় অবশ্য পাখি মারতেও চায় না। সে জানে, এয়ার গান দিয়ে বাঘ ভাল্লুক মারা যায় না, কিন্তু একটা শেয়ালও কি মরবে না?

সুজয়, রাণা আর খোকন সন্ধের পর জলগাঁও-এর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। শহর ছাড়িয়ে একটু মাঠের দিকে গিয়ে ঝোঁপের পাশে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে থাকে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ওরা রোজই শেয়ালের ডাক শোনে, কিন্তু কোনওদিন কোনও শেয়াল চোখে দেখেনি। রাণার ধারণা, শেয়াল ঠিক অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতন দেখতে।

কলকাতায় থাকতে সুজয় একা একা রাস্তায় বেরোতে পারে না। কিন্তু রাণা আর খোকন এখানে যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারে। ছোট শহর, হারিয়ে যাবার তো ভয় নেই। যত দূরেই যাও, ট্রেনের আওয়াজ ঠিক শোনা যাবেই-আর তাহলেই বুঝতে পারা যাবে, কোন দিকে স্টেশন। আর ট্রেনের আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, কটা বাজে।

অনেকক্ষণ মাঠের ধারে বসে থেকেও ওরা একটাও শেয়াল দেখতে পেল না। এমনকি শেয়ালের ডাকও শুনতে পাচ্ছে না। শেয়ালগুলো কি জেনে গেছে যে, ওরা বন্দুক হাতে নিয়ে লুকিয়ে আছে? শেয়ালের তো দারুণ বুদ্ধি।

একটা ট্রেনের আওয়াজ শুনেই ওরা বুঝলো, নাগপুর প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে। তার মানে এখন সওয়া আটটা বাজে। এবার রাত্তিরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এখন ওদের খোঁজাখুঁজি করবে সবাই।

সুজয় বলল, চল ভাই, এবার বাড়ি যাই।

রাণা বলল, খেয়েদেয়ে আবার আসবি? বেশি রাত্তিরে নিশ্চয়ই শেয়ালগুলো বেরুবে।

খোকন একটু বোকাসোকা ধরনের। সে জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে দাদা, ফক্সগুলো শুধু নাইট-এ বেরোয় কেন?

রাণা বলল, ওরা খাবার খুঁজতে বেরুবে না? ওদের বুঝি খিদে পায় না?

খোকন বলল, আমারও খিদে পেয়েছে।

সুজয় ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বন্দুকটা তুলে নিয়েছে কাঁধে। সামনের মাঠটায় কুচকুচে অন্ধকার। আকাশে আজ তারা দেখা যাচ্ছে না, চাঁদও নেই, কিন্তু আকাশ ঠিকই আছে। যত অন্ধকার রাতই হোক, আকাশ ঠিক দেখা যায়।

রাণা বলল, চল, বাড়িতে খেয়েদেয়ে নিয়েই আমরা চুপি-চুপি আবার চলে আসব।

সুজয় বলল, মামাবাবু রাগ করবেন না?

রাণা বলল, বাবা জানতেই পারবেন না। তুই আর আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। তারপর একটু বাদে বাথরুমের পাশের দরজা দিয়ে বাগানের পেছন দিকটায় বেরিয়েই এক দৌড়। ফেরার সময় আবার চুপি-চুপি পেছন দিক দিয়ে ঢুকব। তুই পাঁচিল টপকাতে পারবি তো?

খোকন বলল, তোমরা দুজনে শুধু আসবে? আমাকে আনবে না?

রাণা বলল, না। শুধু আমি আর জয়।

খোকন বলল, হ্যাঁ, আমিও আসব।

রাণা ধমক দিয়ে বলল, না। তোর আসা চলবে না। তাহলে সবাই জেনে যাবে।

খোকন বলল, তাহলে আমি বাবাকে বলে দেব।

রাণা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমনসময় মাঠে কিসের যেন একটা শব্দ হল। ওরা চমকে ঘুরে তাকাল। শেয়াল-টেয়াল কিছু নয়, ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। রাণা সেদিকে টর্চ ফেলতেই দুটো বড়-বড় চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তাতে কিন্তু ওরা একটুও ভয় পেল না। কেননা ব্যাপারটা তক্ষুনি বোঝা গেল। একটা গরুর গাড়ি আসছে। রাত্তিরবেলা গরু কিংবা ঘোড়ার চোখে আলো ফেললে তাদের চোখগুলো অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করে।

গাড়িটা কিন্তু গরুর গাড়ি নয়। এদিকে গরুর গাড়ির বদলে ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখা যায়। সুজয় বলল, ও একটা ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি।

রাণা হেসে ফেলল সে কথা শুনে। ওরা গরুর গাড়িকে বলে বয়েল গাড়ি। আর এগুলোকে ওরা নাম দিয়েছে ঠেকা। সে হাসতে-হাসতে বলল, ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি আবার কি? একি সোনার পাথর বাটি নাকি?

সুজয় লজ্জা পেল। সে বুঝেছে যে তার ভুল। কিন্তু এ গাড়িগুলোকে বাংলায় কি বলবে সে ভেবেই পায় না। ঘোড়ার গাড়ি বললে অন্যরকম গাড়ি বোঝায়। এটা কিন্তু ঠিক গরুর গাড়ি যেমন হয়, সেই রকমই তো, শুধু গরুর বদলে ঘোড়ায় টানছে।

গাড়িটা আস্তে-আস্তে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। রাণা সব সময় টর্চ জ্বেলে রেখেছে। গাড়িটা ঝকঝকে নতুন, কোনও মালপত্র নেই, একজন শুধু গাড়োয়ান ওপরে বসে আছে। গাড়োয়ানটি মাথায় এমনভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে যে, ঠিক মনে হয় ঘোমটা। সে ওদের তিনজনের দিকে একবারও তাকালো না। লোকটা অসম্ভব লম্বা। ঘোড়াটা শুধু ওদের দিকে একবার মুখ ফেরাতেই টর্চের আলোয় চোখ দুটো সেইরকম জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল।

গাড়িটা একটু দূরে চলে গেছে। রাণা টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। বাড়ি যাবার জন্য এক-পা বাড়িয়েই সে বলল, চল, ওই ঠেকাটায় পিছনে উঠে পড়বি? তাহলে আর হাঁটতে হবে না।

সুজয় এই সময় একটা কথা মনে পড়ায় দারুণ চমকে উঠল। রাণার হাত চেপে ধরে বলল, এই, তুই একটা জিনিস লক্ষ্য করিসনি?

–কি?--ওই ঘোড়াটার দুটো শিং ছিল। ঘোড়ার কখনও শিং হয়?

–কি পাগলের মতন কথা বলছিস!

–সত্যি, আমি নিজের চোখে দেখলাম। তোরা দেখিসনি?

গাড়িটা তখনও খুব বেশি দূরে যায়নি। চাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটু একটু। পেছন দিকের আলোটা দুলছে। এখনও দৌড়ে গেলে গাড়িটাকে ধরা যায়।

সুজয় খুব উত্তেজিত বোধ করছে। শিংওয়ালা ঘোড়া সে কখনও দেখেনি। এই জন্যই গাড়িটাকে দেখে তার ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি মনে হয়েছিল। গরুর গাড়ির মতন দেখতে

গাড়িটা, সেটা টানছে গরুর বদলে ঘোড়া-সেই ঘোড়ার আবার শিং রয়েছে। এর মানে কি?

রাণা বলল, ঘোড়র আবার শিং কি? তুই নিশ্চয়ই কান দুটো দেখেছিস।

সুজয় বলল, মোটেই না। আমার অত দেখতে ভুল হয় না।

খোকন ভালো বাংলা জানে না। সে জিগ্যেস করল, দাদা, শিং কি? হোয়াট ইজ শিং?

সুজয় বলল, হর্ন? এ পেয়ার অব হর্নস।

খোকন বলল, হর্সের হর্ন? এহে-হে-হে-হে। জয়দাদা কি ফানি কথা বলে!

সুজয় বলল, আমি স্পষ্ট দেখেছি! চল, দৌড়ে চল, আমি তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিনজনেই চো করে ছুট দিল। খোকন বয়েসে ছোট হলেও সে-ই সবচেয়ে জোরে ছুটতে পারে। স্কুলের স্পোর্টসে হান্ড্রেড মিটার রেস-এ সে ফার্স্ট হয়। রাণা আর সুজয় প্রায় সমান-সমান। রাণার হাতে টর্চ, সুজয়ের হাতে এয়ার গান।

কিন্তু ওরা এত জোরে ছুটলেও গাড়িটাকে ধরতে পারছে না। গাড়িটা যেন ঠিক সমান দূরেই থেকে যাচ্ছে। গরুর গাড়ি কি এত জোরে যেতে পারে? না, না, গরুর গাড়ি তো নয়, ঘোড়ায় টানা গাড়ি!

রাণা চেঁচিয়ে উঠল, এ ঠেকাওয়ালা, রোকে, রোকে।

গাড়িটা তাতেও থামল না। তখন রাণা ওই কথাটাই মারাঠী ভাষায় বলল। তবু গাড়িটা সমান জোরে যাচ্ছে।

খোকন বলল, আমি ঠিক ধরব।

সঙ্গে-সঙ্গেই খোকন তীরের মতন বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই গাড়িটাকে ধরে ফেলে ঝপাং করে লাফিয়ে উঠে বসলো পেছন দিকটায়। এবার গাড়িটা থামল। সুজয় আর রাণাও পৌঁছে গেল একটু বাদেই।

সুজয় দেখল, লম্বা গাড়োয়ানটির পাশে আরও একজন বসে আছে। একে তো সে আগে দেখেনি। এই লোকটি আবার এল কোথা থেকে। গাড়িটা তো ফাঁকাই ছিল। এই লোকটিও সারা গা-মাথা কম্বলে মুড়ি দিয়ে এমন ভাবে বসে আছে যে, অন্ধকারে প্রায় মিয়ে যাবার মতন। হয়তো সেই জন্যই আগের বার নজরে পড়েনি।

রাণা গাড়োয়ানের উদ্দেশে বলল, আপনাকে থামতে বলেছিলাম, থামছিলেন না কেন?

সুজয় ব্যস্ত হয়ে বলল, এই রাণা, ঘোড়া দুটোর ওপর টর্চ ফ্যাল!

খোকন বলল, হর্সের হর্ন হর্সের হর্ন, হে-হে-হে-হে।

লম্বা গাড়োয়ানটি কৌতূহলের সঙ্গে ঝুঁকে খোকনের দিকে তাকালো। কি বুঝল কে জানে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

রাণা টর্চ ফেলল, ওরা তিনজনেই দেখল, ঘোড়া দুটো শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শিং-টিং কিছু নেই। এদিককার ঘোড়াগুলো ছোট, টাটু ঘোড়া যাকে বলে।

রাণা জিগ্যেস করল, কই রে, শিং কোথায়?

সুজয় এতই অবাক হয়ে গেছে যে কথা বলতে পারছে না। তা হলে কি সে সত্যিই ভুল দেখল? ভাগলপুরী গরুর মতন বড়-বড় বাঁকানো শিং দেখেছিল। কিন্তু এখন তো নেই!

কলকাতার ছেলেরা তো খুব চালাক হয়। তাই তাদের বোকা বানাতে পারলে বাইরের ছেলেরা খুব আনন্দ পায়। রাণা তাই ঠাট্টা করে বলল, কি রে জয়, তোদের কলকাতার ঘোড়ার বুঝি শিং থাকে। আমরা বাবা কখনও ঘোড়ার শিং দেখিনি!

খোকন হাসতে হাসতে বলল, কি গাড়োয়ানজি, ঘোড়া কা শিং হোতা হ্যাঁয়?

গাড়োয়ান দুজন কেউ একটাও কথা বলল না।

খোকন বলল, সিংহেরও শিং থাকে না। রাণা বলল, শিং নেই তবু নাম তার সিংহ!

খোকন বলল, ঘোড়ারও শিং থাকে না ডিমও হয় না! বলেন, ঘোড়ার ডিম! কিন্তু ওই কথাটা ইংলিশে ট্রানস্লেশন করতে পারবে?

এইরকম ভাবে ওরা সুজয়কে রাগাচ্ছে। সুজয় কি আর বলবে, চুপ করে রইল।

রাণা একটা ঘোড়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, শুধু তো কান দেখছি, শিং-এর ভাঙা দাগও তো নেই!

সুজয় বলল, ঠিক আছে বাবা, আমার ভুল হয়েছে!

রাণা লম্বা গাড়োয়ানটির উদ্দেশে বলল, আপনার গাড়িতে আমাদের একটু নিয়ে যাবেন? আপনি স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন?

লম্বা গাড়োয়ানটির মতন এমন লম্বা আর ফর্সা গাড়োয়ান সুজয় আগে কখনও দেখেনি। পাশের লোকটিও লম্বা, তবে অতটা নয়–এরও রং খুব ফর্সা, শুধু মুখটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

লম্বা গাড়োয়ানটি রাণার কথা শুনে দু-দিকে ঘাড় নেড়ে জানালো, না। তারপর আর কিছু না বলে আবার জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

বাকি রাস্তাটা সুজয় আর একটাও কথা বলল না। রাণা আর খোকন আবার শেয়াল মারার কথা বলতে লাগল।

মামাবাবুর বাড়ির সামনের গোল বারান্দায় বড়োরা সবাই মিলে গল্প করছিলেন। সুজয়ের মামাবাবু, মামিমা, বাবা, মা, ছোড়দি, আরও দুজন অন্য বাড়ির লোক। কি একটা কথায় ওঁরা খুব হাসছিলেন বলেই বোঝা গেল, সুজয়দের দেরি করে ফেরার জন্য কেউ রাগ করেননি।

মামিমা বললেন, কি রে, তোরা কোথায় গিয়েছিলি?

শেয়াল মামাবাবুর বাড়ির সাদামা, ছোড়দি, আর দুজর দেরি করে

রাণা হাসতে-হাসতে সুজয়ের মাকে বলল, জানো সেজোমাসি, জয় আজকে আমাদের ঘোড়ার শিং দেখাচ্ছিল।

সুজয়ের মা বললেন, সে আবার কি?

রাণা বলল, হ্যাঁ, ঘোড়ার মাথায় গরুর শিং!

খোকন বলল, ইউনিকর্ন কিন্তু নয়। দুটো করে–জয়দাদা বলেছে, এ পেয়ার অব হর্নস। খোকন বল, ঘোড়ার আবার কি,

সুজয় মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যরা বেশ মজা পেয়েছে। সুজয়ের ছোড়দি ঝর্ণা বলল, কি হয়েছে বল না!

রাণা বলল, একটা ঠেকা গাড়ি যাচ্ছিল, জয় বলল কিনা ঘোড়া দুটোর শিং আছে। আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি শিং ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু ঘোড়ার কান লটপট করছে।

আরও কিছুক্ষণ এই নিয়ে ঠাট্টা করলো ওরা। সুজয় ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য বলল, খিদে পেয়েছে, এবার খেতে দাও!

রাণা বলল, আমরা আরও তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম। ওই গাড়িটা ফাঁকা ছিল একজন মোটা গাড়োয়ান, আমরা বললাম আমাদের নিয়ে আসতে

সুজয় বলল, একজন না দুজন গাড়োয়ান!

এবার রাণা রীতিমতো অবাক হয়ে বলল, দুজন কোথায়? একজনই তো মোটে ছিল।

সুজয় জোর দিয়ে বলল, মোটেই একজন নয়। দুজন।

রাণা বলল, খোকন, ক'জন গাড়োয়ান ছিল রে?

খোকন বলল, ওনলি ওয়ান।

সুজয় বলল, তোরা লক্ষ্য করিসনি। আর একজন পাশে বসেছিল।

রাণা বলল, আমরা দুজনে কেউ দেখলাম না, আর তুই একা দেখলি? কি মিথ্যে কথা বলতে পারিস! একবার বলছিস ঘোড়ার শিং, আবার বলছিস একজনের জায়গায় দুজন গাড়োয়ান–

সুজয় এবার রেগে গিয়ে চাঁচামেচি লাগিয়ে দিল। ঘোড়ার শিং তার চোখের ভুল হতে পারে, কিন্তু দুজন গাড়োয়ানকে ওরা একজন বলছে কেন?

সুজয় সহজে মিথ্যে কথা বলে না। এই বছরে মাত্র দুটো মিথ্যে কথা বলেছে। যে যখন সত্যি কথা বলে, তখনও কেউ অবিশ্বাস করলে তার কান্না এসে যায়। কান্না আর রাগ মিশিয়ে সে এমন চঁচামেচি করতে লাগল যে, বড়োরা জোর করে থামিয়ে দিলেন ওদের।

ছোড়দি বললেন, জয়টা আজকাল বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ট্রেনে আসবার সময়, মনে নেই, জানলা দিয়ে একটা বই ফেলে দিয়েছিল?

মা বললেন, থাক থাক। ও-সব কথা থাক এখন। চল, খেতে চল।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বাদেই শোবার পালা। রাণা আর খোকন হোস্টেলে থাকে তো, ওদের তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া স্বভাব। বিছানায় শুয়েই ঘুমোল। রাণা যে বলেছিল, রাত্তিরে আবার বেরুবে, সেকথা তার মনেই পড়লো না। অবশ্য আজ সুজয় মোটেই ওর সঙ্গে আর যেত না।

শুয়ে-শুয়ে সুজয় ভাবতে লাগল, রাণা আর খোকন দুজন গাড়োয়ান দেখেও একজন বলল কেন? শুধু তাকে রাগাবার জন্য কি? আর সে-ই বা ঘোড়ার শিং দুটো ভুল দেখলো কি করে?

সেই রাত্রে সুজয় স্বপ্ন দেখলো, সে একটা দারুণ মন্তর শিখে গেছে। সেই মন্তর দিয়ে সে একটা বেড়ালকে পায়রা করে দিতে পারে, গাধাকে কুকুর করে দিতে পারে। শিং ছাড়া গরু আর শিংওয়ালা ঘোড়া বানাতে পারে। এমনকি রাণা আর খোকনকেও সে পাথরের পুতুল করে দিতে পারে। সে ম্যানড্রেকের চেয়েও ভালো ম্যাজিক দেখাতে পারে এখন।

.

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সুজয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্ন তো আর সত্যি হয় না। সে কোনও মন্ত্র কিংবা ম্যাজিকই শেখেনি।

পরীক্ষা করবার জন্য সে টেবিলের ওপরে রাখা গোল ঘড়িটার দিকে যাদুকরের মতন হাত নেড়ে বলল, এই ঘড়িটা এক্ষুনি একটা টিয়া পাখি হয়ে যাক! টিয়া পাখি হয়ে থাক।

কিছুই হল না। ঘড়িটা টিকটিক করতে লাগল। আর সেই সময়েই দেওয়ালের ওপর থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, ঠিক-ঠিক!

এই সময়েই টিকটিকিটার ডাকবার কি কোনও মানে আছে! সুজয়ের খুব রাগ হল টিকটিকিটার ওপর। সে ওটাকে তাড়া করে গেল। টিকটিকিটা সুরুৎ করে ঢুকে গেল ঘুলঘুলির মধ্যে।

রাণা আর খোকন তখনও ঘুমোচ্ছে। সুজয় ওদের ডাকল না। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাগানে। বাড়ির আর কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।

ঘাসের ওপর শিশির পড়ে আছে। ফুলগাছের ফুল আর পাতাও ভিজে ভিজে। গুলমোহর গাছ দুটোর নিচে অজস্র পাপড়ি ঝরে পড়েছে। ফুরফর করছে ঠান্ডা হাওয়া। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

সুজয় একা একা বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল বাগানে। আর মনে মনে ভাবতে লাগল, সত্যিই কি তার চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ! নইলে সে কাল রাত্তিরে ওরকম ভুল দেখল কেন?

আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখা যাক তো, সত্যিই তার চোখ খারাপ কি না। বাগানের এক কোণে পাশাপাশি তিনটে গোলাপ ফুলের গাছ। সাদা রঙের গোলাপ। ওই তিনটে গাছে সবসুদ্ধ কটা গোলাপ ফুটে আছে? সুজয় দূর থেকে গুনল-সাতটা।

তারপর এক ছুটে কাছে গিয়ে দেখলো, ঠিক সাতটাই ফুল। দূরের ইউক্যালিপটাস গাছটার কটা ডাল। চারটে! সুজয় ঠিক দেখতে পাচ্ছে। সুজয় মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। মেঘ-টেঘ নেই, আকাশ তকতকে নীল। ঝিকমিক করছে রোদ্দুর, তাতে তাপ নেই। এখন সূর্যের দিকেও তাকানো যায়। কত লক্ষ কোটি-কোটি মাইল দূরে সূর্য, তাও তো মানুষ দেখতে পায়।

সুজয় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, এমনসময় এক ঝাক টিয়া পাখি উড়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। সুজয় গুনতে লাগল এক, দুই, তিন, মোটমাট আটটা। এর মধ্যে সাতটা টিয়া এক সঙ্গে আঁক বেঁধে যাচ্ছে আর একটা টিয়া একটু পেছনে পড়ে টি-টি-টি করে ডাকছে।

সুজয়ের বেশ মজা লাগলো। এ ক'দিন সে তো একটাও টিয়া পাখি দেখেনি এখানে। আজ সকালেই সে কিনা ঘড়িটাকে টিয়া পাখি করে দিতে চাইছিল, অমনি কোথা থেকে

এল এক ঝাঁক টিয়া। এরকম অনেক মজার মজার ব্যাপার হয়। তুমি মনে-মনে যা ভাবছ, হঠাৎ সেটা চোখের সামনে দেখা যায়। তুমি মনে-মনে একটা গানের লাইন ভাবছ, হঠাৎ সেই গানটাই তখন রেডিওতে শোনো যায়। হয় না এরকম?

সুজয়ের মনে হল, আচ্ছা, পেছনে যে টিয়াটা একলা যাচ্ছে সেইটাই তাদের ঘড়িটা নয় তো। ম্যাজিকটা একটু দেরিতে বোধহয় কাজ হয়েছে। এই কথা ভেবেই সুজয় এমন উত্তেজিত হয়ে গেল যে, সে ছুটে দেখতে গেল টেবিলের ওপর তাদের ঘড়িটা এখনও আছে কিনা। বাগানের দিকের জানলা দিয়েই উঁকি মারলো ঘরে।

সুজয় কি দেখল?

কি আবার দেখবে, ঘড়িটা ঠিক টেবিলের ওপর টিকটিক করছে। ঘড়ি আবার টিয়া পাখি হয় নাকি? সুজয়েরই শুধু এরকম অদ্ভুত কথা মনে হয়। ওইসব কথা ভেবে ভেবে সে মনে-মনে খেলা করতে ভালোবাসে।

সুজয় মাঝে-মাঝেই চোখে নানা রকম ভুল দেখে। কিন্তু চোখে ভুল দেখা তো দোষের কিছু নয়। সবাই চোখে ভুল দেখে। আমরা যখন কাঁচের গেলাসে এক গেলাস বেশ পরিষ্কার জল খেয়ে ফেলি, তখন কি আমরা বুঝতে পারি যে ওই জলের মধ্যে কত অসংখ্য বীজাণু কিলবিল করছে? স্বাস্থ্য বইতে কিন্তু লেখা আছে, সত্যি ওইরকম থাকে।

জানলা দিয়ে এক ফালি রোদ্দুর এসে পড়লে আমরা দেখতে পাই, সেই রোদ্দুরের মধ্যে কত কি ছোট-ছোট জিনিস উড়ছে। ঘরের অন্য কোনও জায়গায় সেরকম নেই। আসলে কিন্তু সব জায়গার হাওয়াতেই ওইরকম রয়েছে-আমরা দেখতে পাই না, রাস্তায় অনেকখানি রোদ্দুর থাকলেও তার মধ্যে দেখতে পাই না।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে সুজয় বাগানে ঘুরছিল, হঠাৎ দেখল, বাগানের গেটের কাছে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গেট তালাবন্ধ।

নিশ্চয়ই মামাবাবুকে ওরা ডাকতে এসেছে–এই ভেবে সুজয় গেটের দিকে এগিয়ে গেল। লোক দুটির কাছে এসে সুজয় এমন চমকে গেল যে, তার বুকের মধ্যে দুপদুপ শব্দ হতে লাগলো। চমকাবে না? গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে কাল রাত্তিরের সেই ঠেকাগাড়ির লোক দুটো। সেই লম্বা গাড়োয়ান আর তার সঙ্গী। গাড়িটা কিন্তু নেই। এত সকালে ওরা এখানে কি করছে?

সুজয় কিন্তু ভয় পায়নি। দিনের আলোয় দুজন লোককে দেখে ভয় পাবে কেন? শুধু চমকে গেছে। তা ছাড়া, লোক দুটিকে দেখলে একটুও ভয় করে না। ভারী সুন্দর তাদের মুখ এবং দু-জনেই হাসি-হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

লম্বা লোকটি জিগ্যেস করলো, বাংলা না হিন্দি?

সুজয় বলল, হাম বাঙালি। কলকাতায় থাকতা হ্যাঁয়।

লম্বা লোকটি এবার স্পষ্ট বাংলায় বলল, আপনার নাম কি?

সুজয়কে কেউ কখনও আপনি বলে না। সুজয় তো দারুণ খুশি। সে বলল, আমার নাম সুজয় মুখোপাধ্যায়। ডাকনাম জয়। ডাকনামটাই আমার বেশি ভালো লাগে।

–জয়বাবু, আপনারা এখানে বেড়াতে এসেছেন?

–হ্যাঁ।

লোক দুটিকে দেখে এখন মোটেই গাড়োয়ান মনে হয় না। বোধহয় কাল রাত্তিরে শখ করে গাড়ি চালাচ্ছিল। মারাঠীদের মতন মালকোচা দিয়ে ধুতি পরা, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি আর দু-জনের গায়েই সাদা চাদর জড়ানো। খুব ফর্সা রং, স্বাস্থ্য খুব ভালো। তবে ওদের দাড়িগোঁফ নেই, হাতে পায়ে লোম নেই, দু-জনের মাথাতেই পাগড়ি! দাড়িগোঁফ না থাকলেও ওদের চীনেম্যানের মতন মনে হয় না–টিকোলো নাক, টানাটানা চোখ। সুজয় বলল, কাল সন্ধ্যেবেলা আপনাদের দেখেছিলাম। আপনারা বাংলা জানেন?

–আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম।

সুজয়ের ইচ্ছে হল, তক্ষুনি রাণা আর খোকনকে ডেকে এনে দেখায়, কাল সত্যিই দু'জন লোক ছিল কিনা। সে অত ভুল দেখে না। কাল রাণা তাকে মিথ্যেবাদী বলেছিল বলে তার এত রাগ হয়েছিল!

কিন্তু এদের দাঁড় করিয়ে রেখে তো রাণাদের ডাকতে যাওয়া যায় না। তাই সে বলল, আপনারা ভেতরে আসবেন না?

লম্বা লোকটি বলল, না।

তার পাশের লোকটি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার সে বলল, আচ্ছা জয়বাবু, ঘোড়ার শিং হয় না কখনও, তাই না?

সুজয় লজ্জা পেয়ে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল না।

লোকটি তখন জিগ্যেস করল, তাহলে ঘড়ি কি টিয়া পাখি হয়?

এবার সুজয় শুধু চমকে উঠল না, ভয় পেয়ে গেল। সে যে ঘড়িটাকে টিয়া পাখি করতে চেয়েছিল, সেকথা এরা জানবে কি করে? আর কেউ তো জানে না! এরা কি তখন জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছে?

কিংবা, এই লোক দুটোই বোধহয় ম্যাজিক জানে। সে বইতে পড়েছে, ভালো ভালো ম্যাজিসিয়ানরা কারুর চোখের দিকে তাকিয়েই তার মনে কথা বুঝতে পারে।

সুজয় শুকনো গলায় জিগ্যেস করল, আপনারা কি ম্যাজিক জানেন?

লোক দুটি ঠিক সুজয়ের মতনই দুদিকে মাথা নেড়ে হাসিমুখে বলল, না।

লোক দুটি এত ভোরবেলা কেন এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সুজয় সেটাও বুঝতে পারছে না। ভেতরেও আসতে চাইছে না ওরা।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনারা মামাবাবুকে ডাকতে এসেছেন?

লম্বা লোকটি বলল, না।

পাশের লোকটি বলল, আপনাকেই দেখতে এসেছি।

এবার সুজয়ের গা-ছমছম করতে লাগল। এদের কথাবার্তা যেন কেমন-কেমন! এরা মনের কথা জানতে পারে কী করে? কেনই বা সুজয়কে দেখতে এসেছে। সুজয় কি কোন দোষ করেছে?

অথচ সকালবেলাতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। রাত্তিরে অন্ধকারের মধ্যে সবাই একটু-আধটু ভয় পেতে পারে। কিন্তু অর্জুন আর কৃষ্ণ, টার্জন আর অরণ্যদেবের গল্প যে পড়েছে–তার কি দিনের বেলা ভয় পাওয়া মানায়?

সুজয় মনে-মনে সাহস এনে বলল, আপনারা কে?

লম্বা লোকটি বলল, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

সুজয় বলল, তাহলে কাল রাত্তিরে ওই ঠেকাগাড়ি চালাচ্ছিলেন কেন?

এবার ওরা কোনও উত্তর দেবার আগেই রাস্তার দুটো কুকুর ছুটে এল গেটের কাছে। লোক দু-জনের গায়ের গন্ধ শুঁকে অসম্ভব জোরে ঘেউঘেউ করে ডাকতে লাগল। এমনভাবে লাফাচ্ছে, যেন এক্ষুনি কামড়ে দেবে। রাস্তার কুকুররা অচেনা মানুষ দেখলে অনেক সময় এইরকম করে।

সুজয় কুকুরের কাছাকাছি থাকা একদম পছন্দ করে না। কিন্তু তার কোনও বিপদ নেই এখন, সে গেটের এপাশে রয়েছে।

লোক দুটি কুকুর দেখে ভয় পেলে না। লম্বা লোকটি তাকালো বেঁটে লোকটির চোখের দিকে। বেঁটে লোকটি দু-হাতের আঙ্গুল নেড়ে ইশারায় কি যেন বলল। লম্বা লোকটিও আঙুল নেড়ে ইশারা করল।

বেঁটে লোকটি সুজয়কে জিগ্যেস করল, এই কুকুর কি মানুষকে কামড়ায় নাকি?

সুজয় বলল, হ্যাঁ। অনেক সময় কামড়ে দেয়।

–তাহলে লোকেরা সব কুকুরগুলোকে মেরে ফেলে না কেন?

লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, সব কুকুর কামড়ায় না। পোষা কুকুর কামড়ায় না।

বলতে-না-বলতেই একটা কুকুর ঘ্যাক করে লম্বা লোকটিকেই কামড়ে দিল। পায়ে এত জোর কামড়ে দিয়েছে, যেন মনে হয় মাংস ছিঁড়ে নেবে।

লম্বা লোকটি এক ঝটিকায় পা-টা ছাড়িয়ে নিল। তারপর কুকুরটাকে এক লাথি মারতেই কুকুরটা একেবারে হাওয়া দিয়ে উড়ে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। বাবাঃ লোকটার পায়ে কি অসম্ভব জোর! এ যদি ফুটবলের সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলে তাহলে প্রত্যেক মিনিটে একটা করে গোল দেবে।

বেঁটে লোকটা অন্য কুকুরটাকে মারবার জন্য পা তুলেছে, কিন্তু প্রথম কুকুরটার দশা দেখে দ্বিতীয় কুকুরটা ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে এমনভাবে দৌড়ল যে, কয়েক মুহূতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুজয় লম্বা লোকটিকে বলল, ইস্, আপনাকে দারুন জোরে কামড়ে দিয়েছে, না!

লম্বা লোকটার মুখে ব্যাথার চিতুমাত্র নেই। তখনও মুখখানা হাসিমাখা। বলল, ই বড্ড জোরে–

–কই, আপনার রক্ত বেরোয়নি তো?

লম্বা লোকটি বলল, রক্ত বেরোয়নি বুঝি? কই দেখি!

সে ঝুঁকে পায়ের সেই জায়গাটায় হাত দিতেই গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। অনেক রক্ত। তারপর সে বলল, এই তো রক্ত। জয়বাবু, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

জয় সত্যিই আগে রক্ত দেখতে পায়নি। এখন এত রক্ত দেখে বলল, আমি গেটের চাবি নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা ভেতরে আসুন। আমার বাবার কাছে অনেক রকম ওষুধ আছে।

লম্বা লোকটি বলল, থাক, ওষুধের দরকার নেই।

জয় বলল, না না, ওরকম করবেন না। কুকুরে কামড়ালে কি হয় জানেন? জলাতঙ্ক অসুখ হয়।

ওরা সে কথার কোনও মূল্যই না দিয়ে বলল, আচ্ছা জয়বাবু, চলি!

বলেই ওরা পেছন ফিরে হাঁটতে লাগল। যতক্ষণ না ওরা রাস্তার মোড়ে বেঁকে গেল, ততক্ষণ সুজয় তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। ঠিক মোড় ঘুরবার সময় ওরা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে আর একবার হাসল। ওদের কি গায়ে ব্যথা লাগে না? কুকুরে কামড়াবার পরও হাসতে পারে কি করে?

প্রথম দিকে একটু ভয় ভয় করলেও তোক দুটিকে সুজয়ের ভালোই লাগছিল। তার ইচ্ছে করছিল, ওদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে। হঠাৎ যে কোথা থেকে কুকুর দুটো এল! লম্বা লোকটিকে কুকুরে কামড়ে দেবার জন্য সুজয়ের মনে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব হল।

গেট থেকে ফিরে আসতে-আসতে সুজয় ভাবল, এই লোক দুটোর কথা সে বাড়ির কাউকে বলবে না। তোক দুটো বেশ ভালো হলেও কীরকম যেন অদ্ভুত! এদের কথা বললে রাণা আর খোকন যদি অবিশ্বাস করে! একটা লোককে কুকুরে কামড়ালে সে ব্যাথা পায় না–একথা কি ওরা মানতে চাইবে? তার চেয়ে বাবা কিছু বলার দরকার নেই।

সুজয় ঘরে ফিরে এসে দেখল, তার ছোড়দি ঘুম থেকে উঠেই একটা বই নিয়ে বসেছে। ছোড়দি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। রাত্রিরে যদি কোনও বই নিয়ে শোয় তাহলে সকালবেলা উঠেই আবার সেই বইটা পড়তে শুরু করবে। শেষ না করা পর্যন্ত মুখও ধোবে না।

ছোড়দি চুল আঁচড়ায়নি এখনও। শাড়িও বদলায়নি। গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। বাড়ির আর কেউ এখনও ওঠেনি।

সুজয়কে দেখে ছোড়দি মুখ তুলে বলল, এত ভোরে তুই কোথায় গিয়েছিলি? \সুজয় বলল, এমনি বেড়াচ্ছিলাম।

–অত কুকুর ঘেউঘেউ করছিল কেন?

–রাস্তার কুকুর।

ছোড়দিও কুকুর দেখলে ভয় পায়। সেইজন্যই আবার জিগ্যেস করল, গেট বন্ধ আছে তো?

সুজয় 'হ্যাঁ' বলতেই ছোড়দি আবার নিশ্চিত হয়ে বইতে মনোযোগ দিল। যাক, ছোড়দি লোক দুটোকে দেখতে পায়নি। সুজয়কেও কোনও মিথ্যে কথা বলতে হল না। সুজয় নিজের ঘরে ফিরে দেখল, তখনও রাণা আর খোকন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ঘড়িতে কটা বাজে দেখতে গিয়ে দেখল, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। একটু আগেও তো চলছিল। ঘড়িটা তুলে নিয়ে দু-একবার ঝাঁকুনি দিতেই সেটা আবার চলতে লাগল।

সুজয় তখন ভাবল, ঘড়িটা টিয়াপাখি হয়ে উড়ে গিয়েছিল তো আবার ফিরে এসে চলতে ভুলে গিয়েছিল। এই কথা ভেবে সুজয় মনে-মনেই হাসল। এরকম কখনও হয় না। হলে কিন্তু বেশ হত।

আচ্ছা, ওই লোকটা তার মনের কথা কি করে জানল? নিশ্চয়ই ম্যাজিক জানে ওই লোকটা। ইস, তাকে যদি ওই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দিত।

সুজয় রাণা আর খোকনকে ধাক্কা দিয়ে বললে, এই, ওঠ ওঠা

সেদিন বিকেলবেলা ওরা বাড়িসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে বেড়াতে বেরুল। জলগাঁও এর সবচেয়ে ভালো জায়গার নাম বলিরাম পেট। এখানকার নামগুলো কী অদ্ভুত। পেট আবার জায়গার নাম হয় নাকি? বলিরাম পেট-এ মামাবাবুর এক বন্ধু থাকেন, তিনি সবাইকে চা-জলখাবারের নেমতন্ন করেছেন।

হেঁটেই যাওয়া হবে। বিকেলবেলা ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে, এর মধ্যে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে। বড়রা পেছনে আস্তে-আস্তে আসছেন, আর সুজয়রা সামনে এগিয়ে। রানা এখানকার সব রাস্তাই চেনে।

রাস্তার উলটোদিকে তিন চারটে কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে আর জোরে জোরে ডাকছে। এর মধ্যে সকালের সেই কুকুর দুটোও আছে কিনা কে জানে।

সুজয় ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, ওরে বাবা, কুকুর!

রাণা হেসে বলল, এঃ মা, এত ভয় পাচ্ছিস কেন! এরা কিছু বলে না। দেখবি!

রাণা শিস দিয়ে ডাকল, এই কালু, কাম হিয়ার, কাম হিয়ার! চু-চু-চু-চু।

সুজয় বলল, ডাকিস না, ডাকিস না। এই কুকুরগুলো ভীষণ কামড়ায়।

রাণা বলল, কক্ষনো না। এরা ওই মিষ্টির দোকানওয়ালার পোষা কুকুর।

খোকন বলল, এ বার্কিং ডগ নেভার বাইটস্।

সুজয় বলল, নেভার নয়। সেলডম। সেলডম! সেলডম মানে জানিস? একবার দুবার কামড়াতে পারে।

রাণা বলল, এরা কোনওদিন কারুকে কামড়ায়নি। তুই দোকানটায় জিগ্যেস কর। সুজয় আর একটা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে গেল।

.

হঠাৎ জলগাঁও থেকে অজন্তা-ইলোরায় বেড়াতে যাবার কথা ঠিক হয়ে গেল। মামাবাবুর বন্ধু একটা স্টেশন-ওয়াগন দিয়ে দিলেন ওদের। তিনি বললেন, কলকাতা থেকে এতদূর এসেছেন আর অজন্তা দেখবেন না, তাও কি হয়?

ওদের অবশ্য অজন্তায় বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আগে থেকেই ছিল। এমনভাবে হঠাৎ একটা গাড়ি পেয়ে যাওয়ায় খুব সুবিধে হল। মামাবাবুর বন্ধুর অনেক লরি আর ট্যাসি আছে। ওদের জন্য একটা নতুন স্টেশন-ওয়াগন এসে গেল পরের দিন সকালেই।

সুজয়, রাণা আর খোকন খুব ভোরে উঠে স্নান-টান করে, জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে আছে। তিনজনেই ঠিক করে রেখেছে, জানালার কাছে বসবে। ড্রাইভারের পাশের সিটে কে বসবে–তা অবশ্য ঠিক হয়নি এখনও। মামাবাবু ছুটি পাবেন না বলে যেতে পারবেন না। তাই মামীমাও যাচ্ছেন না। সুজয়ের ছোড়দি ঝর্ণা তার বাবার ক্যামেরাটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। ঝর্ণা খুব ভালো ছবি তোলে। ঝর্ণা সাইকেল চড়তে পারে, সাঁতারেও কলেজের স্পোর্টস প্রথম হয়ে কাপ পেয়েছে।

জিনিসপত্র সব তুলে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। ঠিক হয়েছে, প্রথম দিন ওরা অজন্তা দেখে নিয়ে সেখান থেকে ঔরঙ্গাবাদ চলে যাবে। ঔরঙ্গাবাদে থাকবে হোটেলে। পরদিন ইলোরা

এবং আরও যদি কাছাকাছি কিছু দেখার থাকে। ঔরঙ্গাবাদের কাছেই একটা দুর্গ আছে–সুজয়রা তো সেটা দেখবেই। সব মিলিয়ে চার-পাঁচ দিনের বেড়ানো।

কী চমৎকার রাস্তা। মাঝে-মাঝেই পাহাড় আর ঘন বন। অনেক জায়গা দেখেই মনে হয়, কি সুন্দর পিকনিক করা যায়। এক একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে একটু খেলে নিতে ইচ্ছে করে। একটা নদী প্রায় শুকিয়ে গেছে, বালির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছে একদল লোক। সুজয় সেখানে একবার গাড়ি থামাতে বলল। ড্রাইভারের পাশে বাবা বসে আছেন। বাবা বললেন, না। এখন সময় নষ্ট করা চলবে না। অজন্তার সব কটা গুহা ঘুরে-ঘুরে দেখতে সময় লাগবে।

অজন্তা জায়গাটা যে কীরকম, সুজয় তা ঠিক জানে না। সে শুনেছে, অজন্তার দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকা আছে। আবার গুহার কথা শুনে ভাবে, গুহার মধ্যে তো বাঘ-ভাল্লুক থাকে–সেখানে ছবি থাকবে কি করে?

সেখানে পৌঁছোবার পর তার একেবারে চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন অপূর্ব সুন্দর জায়গা সে জীবনে কখনও দেখেনি। চারপাশে খাড়া-খাড়া পাহাড়। পাহাড়গুলোকে কীরকম গম্ভীর গম্ভীর মনে হয়। ওদের গাড়িটা ঘুরতে-ঘুরতে নেমে এল অনেক নিচে, দুটো পাহাড়ের মাঝখানে। সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। নদীটা ছোট হলেও খুব স্রোত আর জলের রং গেরুয়া।

রাণার এরই মধ্যে খিদে পেয়ে গেছে। আর খোকন যদি কোল্ড ড্রিংকস্-এর দোকান। দেখে, তাহলে কিছুতেই সেখান থেকে নড়বে না। সুজয়েরও একটু-একটু খিদে পেয়েছে–কিন্তু ছোড়দির ভয়ে কিছু বলছে না। বেড়াতে বেরিয়ে কোনওরকম আবদার করলেই ছোড়দি বড্ড বকে। নিজে যে বারবার চা খায়, তার বেলা কিছু নয়।

মা-ই বললেন, পাহাড়ে উঠতে হবে তো আগে ছোটদের কিছু খাইয়ে নাও।

ছোড়দি বলল, শুধু-শুধু সময় নষ্ট! এইজন্যই বাচ্চাগুলোকে রেখে আসতে বলেছিলাম।

ছোড়দি সুজয়ের চেয়ে মাত্র ছ'বছরের বড়। তবু সব সময় আজকাল ওকে বাচ্চা বাচ্চা বলে।

একটা লাল রঙের দোতলা বাড়ির একতলায় খাবার-টাবার সব পাওয়া যায়। ওরা সবাই সেখানে গিয়ে খেতে বসল। আর বাবা ইতিমধ্যে গিয়ে গাইড আর আলো ঠিক করে এলেন। আলো ছাড়া অজন্তার কোনও ছবিই দেখা যায় না।

মস্ত বড় একটা পাহাড় কেটে-কেটে গুহা বানানো হয়েছে। গুহা মানে কি, এক একটা বিরাট হলঘরের মতন। ছোড়দি বলল, প্রায় দু-হাজার বছর আগে বৌদ্ধ শিল্পীরা এইসব গুহা বানিয়ে তার মধ্যে ছবি এঁকেছে। কত বছর যে লেগেছে কে জানে!

গুহাগুলো ঘুরঘুঁটে অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে আগেকার দিনে ছবি আঁকত কি করে? আলো জ্বেলে-জ্বেলে সব দেওয়াল ভর্তি করে ছবি এঁকেছে? সুজয় বুঝতে পারে না, কেন বৌদ্ধরা এত কষ্ট করে ছবি আঁকত।

গাইড ওদের নিয়ে এক একটা গুহায় ঢুকছে আর আলো জ্বেলে জ্বেলে দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ছবি বুঝিয়ে দিচ্ছে। অনেক লোক এমনি এসেছে, যারা আলোও আনেনি, গাইডও আনেনি। তারাও ওদের কাছে এসে ভিড় করে শুনছে।

পাঁচ-ছ'টা গুহা ঘুরেই সুজয়রা একটু ক্লান্ত হয়ে গেল। মা-ও আর হাঁটতে পারছেন না। মাঝে মাঝেই গুহার বাইরে বেরিয়ে বলছেন, দাঁড়াও বাপু, একটু জিরিয়ে নিই।

গুহাগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দার মতন রাস্তা। এক এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে হয়। রাস্তাগুলোর পাশের দিকে নিচু দেয়াল। সেই দেয়াল দিয়ে ঝুঁকলে দেখা যায় অনেক নিচে সেই নদীটা, তার দু-পাশটা কি সুন্দর বাগানের মতন।

ছোড়দি একটুও বিশ্রাম করতে দেবে না। মা জিরোতে বসলেই সে তাড়া দিয়ে বলে, চলো, চলো! এখনও চল্লিশটার বেশি গুহা আছে। সব দেখতে হবে।

একেবারে শেষের দিকের একটা গুহার দেয়ালে বুদ্ধদেবের শুয়ে থাকা একটা বিরাট মূর্তি আছে, সেটা না দেখে ছোড়দি কিছুতেই যাবে না।

ওরা যখন এগারো নম্বর গুহাটা দেখছে-সেখানে অনেক লোকের ভিড়, গাইডবাবুও মস্তবড় বক্তৃতা দিচ্ছে-হঠাৎ সুজয় একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল। ভিড়ের ঠিক পেছনে একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে, লোকটার গা থেকে যেন আলো বেরুচ্ছে মনে হয়। জোনাকির গা থেকে যে-রকম আলো বেরোয়, সেই রকম হালকা নীল রঙের আলো। অন্ধকারের মধ্যে লোকটির চেহারা জ্বলজ্বল করছে।

একটু বাদেই কিন্তু সুজয় সেই লোকটিকে আর দেখতে পেল না। ভালো করে চোখ কচলে নিয়ে আবার তাকাল না। না, কিছুই নেই তো। এসব কি দেখছে সুজয়? সত্যিই দেখল, না স্বপ্ন? সুজয়ের কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? লোকের গা থেকে আবার আলো বেরোয় নাকি!

ভয়ে-ভয়ে সে রাণার দিকে চাইল। রাণা তার পাশে দাঁড়িয়ে একই দিকে তাকিয়ে আছে। রাণা ওই রকম কিছু দেখতে পেলে নিশ্চয়ই বলতো। কিন্তু রাণা কিছু দেখেনি। সুজয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন সে চোখে এত ভুল দেখছে? সুজয় ঠিক করল, সে আর অন্য কোনও দিকে তাকাবে না, সে ছোড়দির পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে সব ছবি দেখবে। এরপর চার-পাঁচটা গুহা ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে ভালো লাগল তারা। এখন সে বুদ্ধ আর অবলোকিতেশ্বরের তফাত পর্যন্ত বুঝে গেছে।

কুড়িখানা গুহা দেখার পর মা বললেন, আমি আর যেতে পারছি না বাপু। আমি এবার এখানে বসলুম। এবার ফিরে চল। ।

ঝর্ণা বলল, এর মধ্যেই? এখনো তো অর্ধেকও হয়নি।

তখন ঠিক হল বাবা আর ছোড়দি গাইডবাবুর সঙ্গে গিয়ে বাকিটা দেখে আসবে। সুজয়রা মায়ের সঙ্গে সেখানেই অপেক্ষা করবে। সুজয় অবশ্য ছোড়দির সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু তা হলে রাণা আর খোকনও যাবে। মাকে তো আর এখানে একা বসিয়ে রাখা যায় না।

ওরা তিনজনে মাকে নিয়ে সেখানে বসে রইল। ছোড়দি আর বাবা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন তাদের পেছনের মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সুজয় বলে উঠল, আরেঃ।

রাণা জিগ্যেস করলো, কি? সুজয় বলল, সেই লোক্টা!

–কোন্ লোকটা?

–সেই ঠেকাগাড়ির লম্বা লোকটা।

রাণা হো-হো করে হেসে উঠল।

সুজয় বলল, হাসছিস কেন? ওই তো লোকটা, দেখতে পাচ্ছিস না?

রাণা বলল, তোর কি মাথা খারাপ? সেই লোকটা এখানে আসবে কি করে?

সুজয় বলল, চল আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

ওরা দুজনে দৌড়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লোকটাকে আর খুঁজে পেল না। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, সে ঠিক সেই লম্বা লোকটাকেই দেখেছে। তার চোখের ভুল নয়। আর ওই লোকটাই একটু আগে গুহার মধ্যে লোকজনের পেছনে। দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওর গা থেকে আলো বেরোচ্ছে।

একটু বাদে দূরে কীরকম যেন হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল। ওরা ব্যস্ত হয়ে তাকাল সেদিকে। কতকগুলো লোক এদিকে ছুটে আসছে। রাণা একজন লোককে ডেকে জিগ্যেস করলে, কেয়া হুয়া?

লোকটি বলল, একঠো জেনানা গির গিয়া!

লোকটি আবার বলল, একজন মেয়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকেছিল, হঠাৎ সে নিচে পড়ে গেছে।

কী সাংঘাতিক কথা! কোনও বিপদের কথা শুনলে সবাই প্রথমে নিজের লোকের কথা ভাবে। মা ভাবলেন, ঝর্ণা পড়ে যায়নি তো? ওর যা সাহস দেখাবার ঝোঁক! মা চোখ বড়-বড় করে বললেন, কি হবে?

.

মা এতক্ষণ হাঁটতে পারছিলেন না। দুর্ঘটনার কথা শুনে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, প্রায় ছুটতে শুরু করলেন। সুজয়ের হাত ধরে কান্না কান্না মুখে বললেন, শিগগির চল–কি সর্বনাশের কথা, কে পড়ে গেল।

মা প্রায় ধরেই নিয়েছেন যে, ঝর্ণাই পড়ে গেছে।

খোকন সবচেয়ে আগে বাঁই করে ছুটে বেরিয়ে গেছে। রাণাও অনেকটা এগিয়ে গেছে। সুজয় মাকে নিয়ে বেশি জোরে ছুটতে সাহস পাচ্ছে না। গত বছর মা খুব অসুখে ভুগেছিলেন, তারপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে একটুতেই হাঁপিয়ে যান। সেই অসুখের পর থেকেই মা সব ব্যাপারে বেশি-বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বেশ দূর থেকেই সুজয় ঝর্ণাকে দেখতে পেয়ে বলল, ওই তো ছোড়দি! ওই তো বাবা!

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, আছে? ঠিক দেখেছিস তো? তাহলে আমি আর দৌড়োতে পারছি না।

মা সেখানেই বসে পড়লেন।

এখান থেকে মায়ের হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই বুঝেই সুজয় একা দৌড়ে গেল এবার।

সবাই পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে দেখছে। জায়গাটায় অসম্ভব ভিড় আর চেঁচামেচি। কিছু কিছু লোক এদিক-সেদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। সুজয় ঝর্ণার কাছে কোনওক্রমে ঠেলেঠুলে উপস্থিত হয়ে বলল, কি হয়েছে ছোড়দি?

ছোড়দি বলল, একটা পাঞ্জাবি মেয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কায়দা করে ব্যালান্স দেখাচ্ছিল, হঠাৎ নিচে পড়ে গেছে!

–কোথায়, কোথায়?

–দেখা যাচ্ছে না। এই, বেশি ঝুঁকিস না!

বাবা সুজয়কে দেখে বললেন, জয়, তোর মা কোথায়?

সুজয় আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, মা ওইখানে বসে আছে।

বাবা বললেন, আমি তোদের মায়ের কাছে যাচ্ছি। তোরা চলে আয়। খোকন, রাণা, জয়–তোরা সব হাত ধরাধরি করে থাক–

কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে হাত ধরাধরি করে থাকা সহজ নয়। তাছাড়া জয় হাত ধরবে কি, সে আবার এখন একটা জিনিস দেখল, যাতে তার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।

জয় দেখল, খানিকটা দূরে ফাঁকা জায়গায় সেই লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার আড়ালে বোধহয় সেই বেঁটে লোকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, এক মুহূর্ত পরে তাকে দেখা গেল। বেঁটে লোকটা লাফিয়ে উঠল পাঁচিলের ওপর। লম্বা লোকটা তাকে আঙুল তুলে কি ইশারা করল, অমনি বেঁটে লোকটা লাফ দিলো নিচের দিকে। বড় বড় সাঁতারুরা যে রকম উঁচু থেকে ডাইভ দেয়, সেইরকম ভাবে মাথার দুপাশে দুটো হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নিচে পড়ে গেল না। পাখির মতন একটু ভেসে রইল হাওয়ায়,

আর তার গা থেকে নীল রঙের জ্বলজ্বলে আলো বেরুতে লাগল। তারপর লোকটা শোঁ-শোঁ করে নামতে লাগল নিচের দিকে, চিলের মতন ঘুরে-ঘুরে।

কিন্তু এই রকম এক্টা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল, অথচ আর কেউ দেখল? একটা লোককে ইচ্ছে করে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখলে অনেকেরই তো ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠবার কথা! কেউ এ বিষয়ে কোনও সাড়া শব্দ করল না। সবাই এখনও নিচের দিকে তাকিয়ে আছে আর পাঞ্জাবি মেয়েটির কথাই বলছে।

সুজয় আর থাকতে পারল না। সে এক দৌড়ে চলে গেল লম্বা লোকটির কাছে। দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, এই যে শুনুন, আপনার বন্ধু…আপনার বন্ধু

লোকটি সুজয়কে দেখে মিষ্টি হেসে বলল, এই যে জয়বাবু, কি খবর?

সুজয় আবার বলল, আপনার বন্ধু লাফিয়ে পড়লেন? এত উঁচু থেকে?

–তাই নাকি? আপনি দেখেছেন?

–হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আপনি দেখেননি?

–আপনি তো অনেক কিছু দেখতে পান!

–বাঃ, আপনার পাশেই তো দাঁড়িয়েছিলেন–আপনি হাত নেড়ে নেড়ে কি সব যেন বললেন। এত উঁচু থেকে লাফালে কি কেউ বাঁচে?

লোকটি সে কথার উত্তর দিল না। সুজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, আপনি তো অনেক কিছু দেখতে পান দেখছি। আমার চোখের দিকে তাকান তো

লোকটি এত লম্বা যে, সুজয়ের মাথা ওর কোমরের কাছে মোটে পৌঁছায়। সুজয়কে তাকাতে হয় চোখ উঁচুর দিকে তুলে।

লোকটি নিচু হয়ে সুজয়ের মুখের কাছে মুখ এনে বলল, এবার ভালো করে তাকান আমার চোখের দিকে।

সুজয় তাকাতেই তার চোখ ঝলসে গেল। যেন দুটো বড় টর্চ লাইটের আলো কেউ তার চোখের ওপর ফেলেছে।

সুজয় চোখ বুজে ফেলতেই লোকটি বলল, কি হল! তাকান আবার! আর একটু দেখি–

সুজয় চোখ পিটপিট করছে, আর কিছুতেই ভালো করে তাকাতে পারছে না। তখন লোকটি খুব জোরে একবার ফুঁ দিতেই সুজয়ের চোখ খুলে গেল।

লোকটির ফুঁ লাগতেই সুজয়ের গা-টা ছ্যাক করে উঠল। লোকটার নিঃশ্বাস কি গরম! ঠিক যেন একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। ওর চোখ দুটো যেন দুটে পাঁচশো পাওয়ারের বাল্ব– সুজয় কিছুতেই সেদিকে চোখ রাখতে পারছে না।

কাঁদো কাঁদো হয়ে সুজয় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর পারছি না।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ের কাছ থেকে সরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সুজয়ের সারা শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ভয়ে নয়। যদিও লোক দুটির ধরনধারণ এতই অদ্ভুত যে, এখন সে ভয় পেলে কেউ তাকে দোষ দেবে না। কিন্তু ওদের গলার আওয়াজ এত মিষ্টি আর বয়েসে এত বড় হয়েও সুজয়কে আপনি করে কথা বলে– সেইজন্য সুজয় ঠিক ভয় পেতেও পারছে না। এখন যে তার শরীর কাঁপছে, তার কারণ হঠাৎ যেন তার খুব জ্বর হয়ে গেছে–তার কান, চোখ, নাক জ্বালা করছে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, এক্ষুনি মাটিতে শুয়ে পড়বে।

সুজয় বলল, আমার কি হল? আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভীষণ জ্বর হয়েছে।

লোকটি বলল, ও কিছু নয়। একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবে।

সুজয় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, পাঁচিলটাতে হেলান দিল। মাথা ঝিমঝিম করছে তার। চোখ দুটোতে ঝাঁপসা দেখছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ছোড়দি এখনও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রাণা আর খোকন চলে গেছে তার বাবা-মায়ের কাছে।

যদিও এখানটায় একটু শীত শীত ভাব–তবু কুলকুল করে ঘাম বইতে লাগল সুজয়ের গা দিয়ে। আস্তে-আস্তে তার জ্বরের ভাবটা কমে গেল।

লোকটি জিগ্যেস করল, জয়বাবু, এখন ভালো লাগছে তো?

সুজয় ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, আপনার চোখ দুটো একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। ইল ইম্ব টেলাস অকষি টুমপে সিনা সিনা যোজং মরডি ঘ্রা মরডি ঘ্রা।

সুজয় ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, কি বললেন? এর মানে কি?

লোকটি যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, না, না, ওটা কিছু নয়। আমি বলছিলাম কি, আপনার চোখে একটা শিরা বেশি আছে। কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজন দু-জনের এরকম থাকে। এরকম থাকলে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি দেখা যায়। আপনার শিরাটায় একটা পর্দা পড়েছিল, এবার থেকে আরও বেশি দেখতে পাবেন।

–আপনার চোখ দিয়ে অত জোর আলো বেরুচ্ছিল কেন?

–আমার চোখ থেকে তো আলো বেরোয়নি।

–আমি যে দেখলাম?

–ওটা অন্য জিনিস। পৃথিবীতে তো এত আলো আছে–খানিকটা আলো যদি এক জায়গায় এনে খুব ঘন করে ধরা যায়–

সুজয় ওই কথাটার ঠিক মানে বুঝতে পারল না। বুঝবার সময়ও পেল না। কারণ, সে দেখল, পাঁচিলের ওপাশ থেকে বেঁটে লোকটা মুখ বাড়িয়েছে। এক লাফে সে এদিকে চলে এল। তার হাতে একটা ছোট ফুলগাছ- একটা মাত্র সাদা ফুল ফুটে আছে। গাছটার তলায় শেকড়ের কাছে ভিজে মাটি দিয়ে গোল করা।

বেঁটে লোকটা লম্বা লোকটার চেয়েও বেশি হাসিখুশি। সে সুজয়কে দেখে একগাল হেসে বলল, আরে, জয়বাবু যে! আবার দেখা হয়ে গেল!

এসব আলাপ করার সময় নেই সুজয়ের। সে উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, আপনি এখান থেকে লাফ দিয়েছিলেন? আবার পাহাড় বেয়ে উঠলেন?

বেঁটে লোকটি বলল, হ্যাঁ। এই গাছটা আনতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর ফুল।

–আপনি এত উঁচু থেকে লাফাতে পারেন? আপনি কি পাখির মতন উড়তে পারেন?

– এটা খুব শক্ত বুঝি?

–শক্ত নয়? আর কেউ পারে কি! আচ্ছা, নিচে যে একটা মেয়ে পড়ে গেছে, আপনি তাকে দেখতে পেলেন না?

বেঁটে লোকটি সুজয়কে এ কথার উত্তর না দিয়ে লম্বা লোকটির দিকে তাকাল। তারপর হাত তুলে আঙুলে-আঙুলে ছুঁইয়ে নানারকম ভঙ্গি করতে লাগল।

সুজয় বুঝতে পারল, ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে চায়, তখন মুখে কিছু বলে না, শুধু আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে।

এই সময় মাইকে একটা ঘোষণা শোনা গেল। প্রথমে কিছু বোঝা যায়নি, কারণ সবাই খুব গোলমাল করছিল। তারপর একটু শান্ত হতেই সুজয় মন দিয়ে শুনল যে মাইকে বলছে, এক্ষুনি সবাইকে নিচে নেমে যেতে হবে। আজ অজন্তার গুহায় কোনও লোককে

আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। সবাইকে নিচে নেমে আসতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রীতমকুমারী নামে একটি পাঞ্জাবি মেয়ে ওপর থেকে পড়ে গেছে তার মৃতদেহ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সুজয় বেঁটে লোকটিকে আবার জিগ্যেস করল, আপনি তো নিচে গিয়েছিলেন, আপনি মেয়েটিকে দেখেননি?

এবারও লোকটি এই কথার উত্তর দিতে চাইল না। হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে। আচ্ছা চলি জয়বাবু!

তখন ঝর্ণা এসে সুজয়ের পিঠে হাত দিয়ে বলল, এই জয়, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? বাবা তখন থেকে ডাকছেন তোকে–শুনতে পাচ্ছিস না?

জয় খুব উৎসাহের সঙ্গে লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে, এই আমার ছোড়দি।

লোক দুটি দু-পায়ের গোড়ালি ঠুকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে অদ্ভুতভাবে নমস্কার করল ঝর্ণাকে। তারপর খুব বিনীত ভাবে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব প্রীত হলাম।

অচেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে ঝর্ণার কোনও লজ্জা-টজ্জা নেই। সে বেঁটে লোকটির হাতের ফুলগাছটা দেখে বলল, বাঃ, ভারি সুন্দর ফুলটা তো। কী ফুল এটা?

সাধারণত এই ভাবে কেউ বললে সবাই ফুলটা ভালো করে দেখবার জন্য এগিয়ে দেয়। লোকটি কিন্তু একটু পিছিয়ে গেল। ফুলগাছটা খুব সাবধানে ধরে বলল, দেখুন না!

ঝর্ণা একটু অবাক হলেও আবার বলল, কি ফুল এটা, এতগুলো পাপড়িওয়ালা সাদা ফুল তো দেখিনি। ফুলটার গন্ধ আছে? নিশ্চয়ই আছে। সব সাদা ফুলেরই গন্ধ থাকে। একটু দিন তো দেখি।

লোকটি তবু দিল না। বলল,, গন্ধ আছে। কিন্তু এ ফুলের গন্ধ শুঁকতে নেই।

–কেন, শুকলে কি হয়?

–গন্ধ শুকলেই ফুলটা মরে যায়।

–তা আবার হয় নাকি?

মাইকে তখনও ঘোষণা চলছে। সুজয়ের বাবা জোরে জোরে ওদের ডাকছেন। ঝর্ণা আর দেরি করল না, সুজয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। লোক দুটি দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

ভিড়ের মধ্যে যাতে কেউ হারিয়ে না যায়, এইজন্য সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে নামতে লাগল নিচে। নিচেও দারুণ ভিড়। অনেকে মিলে এক জায়গায় ঠেলাঠেলি করছে। একগাড়ি পুলিশ এসেছে। ভ্রমণ-বিভাগের কর্মীরাও খুব ব্যস্ত।

নিচে এসে নানারকম গল্প শোনা যেতে লাগল। অনেকেই বলছে যে, তারা দেখেছে একটা লোক মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। সেই লোকটাও পাঞ্জাবি।

কিন্তু তা হলে প্রীতমকুমারীর দেহটা গেল কোথায়? দেহটা তো অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না?

বাবা বললেন, ওসব কিছুই হয়নি। সব গুজব। এক একটা লোকের গুজব রটানোর অভ্যাস থাকে। একজন কেউ রটিয়ে দিলেই অন্যরা তা বিশ্বাস করে।

রাণা অনেক ডিটেকটিভ বই পড়ে। সে বলল, আমি বলতে পারি মেয়েটার কি হয়েছে। ওর দেহটা ওপর থেকে পড়েছে নদীর জলে–তারপর ভাসতে ভাসতে চলে গেছে।

ছোড়দি বলল, নদীটা তো একটু দূরে। মেয়েটা কি উড়তে উড়তে গিয়ে নদীতে পড়বে?

রাণা বলল, না, আগে নিচে পড়ে তারপর গড়াতে-গড়াতে–

–মানুষ কি পাথর যে অতখানি গড়াবে?

–তাহলে কি হয়েছে জানো, অত উঁচু থেকে পড়েছে তো। একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। তারপর টুকরোগুলো সাঁই-সাঁই করে ছিটকে–

–ধ্যাৎ! চুপ কর তো!

বাবা বললেন, চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি? ঔরঙ্গাবাদের দিকেই চলে যাওয়া যাক।

মা বললেন, যা করবার বাপু তাড়াতাড়ি করো। আমি আর এই রোদ্দুরের মধ্যেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

খোকন বলল, আমি কোল্ড ড্রিংকস্ খাব।

ঝর্ণা কিন্তু এক্ষুনি এখান থেকে যেতে চায় না। অজন্তার সব ক'টা গুহা না দেখে সে যাবে না। তাছাড়া বুদ্ধদেবের সেই বিখ্যাত শুয়ে-থাকা মূর্তিই দেখা হল না।

ঝর্ণা বাবাকে বলল, আজ রাত্রে আমরা এখানকার ট্যুরিস্ট লজে থাকব!

রাণা আর সুজয় বলল, হ্যাঁ, আমরা আজ এখানেই থাকব।

খোকন বলল, গ্র্যান্ড হবে।

বাবা ওদের আবদার ফেলতে পারলেন না। গেলেন ট্যুরিস্ট লজে খোঁজ নিতে। ফিরে এলেন কিন্তু নিরাশ হয়ে। একটাও ঘর খালি নেই। আগে থেকে খবর না দিয়ে এলে এখানে জায়গাই পাওয়া যায় না!

এই সময় আবার একটা গোলমাল শোনা গেল। পাহাড়ের ওপর থেকে পুলিশ একটা লোককে ধরে আনছে। আর লোকটা হাউহাউ করে কাঁদছে। লোকটার বিরাট চেহারা, একমুখ দাড়ি, কিন্তু কাঁদছে একেবারে ছোট ছেলেদের মতন।

কি ব্যাপার হয়েছে জানার জন্য সুজয়দের দারুণ কৌতূহল। কিন্তু বাবা আর ওদের যেতে দেবেন না ওদিকে। ওদিকে যা ভিড়! শেষ পর্যন্ত বাবা নিজেই গেলেন খোঁজ আনতে।

বাবা ফিরে আসার আগেই ওরা অন্য লোকের মুখে সব কিছু শুনে ফেলল। সবাই তো এই কথাই বলাবলি করছে।

ওই শিখ ছেলেটি অজন্তার একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পুলিশ ওকে খুঁজে বার করেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর ও স্বীকার করেছে যে,সত্যিই ও প্রীতমকুমারীকে ঠেলে ফেলেছে।

কেন ঠেলে ফেলে দিয়েছে?

তার কারণ, প্রীতমকুমারী ওকে বিয়ে করতে চায়নি। সেইজন্য খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু এখন খুব অনুতাপ হচ্ছে। হায়, হায় কেন ও প্রীতমকুমারীকে মেরে ফেলল।

তাহলে প্রীতমকুমারী নামের একটি মেয়ের সত্যিই দুর্ঘটনা হয়েছে। তবে তার মৃতদেহটা গেল কোথায়?

বাবা ফিরে এসে বললেন, আর দেরি করে লাভ নেই। এখানে তো থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না।

ঝর্ণা অভিমান করে বলল, তাহলে আমাদের আর অজন্তা দেখা হবে না।

বাবা বললেন, আমরা ইলোরা-টিলোরা দেখে আবার তো এই পথেই ফিরব তখন আবার দেখে যাবো!

ঝর্ণা বলল, ঠিক তো?

বাবার কাছ থেকে একেবারে কথা আদায় করে তারপর ঝর্ণা বাসে উঠল।

.

ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। ঔরঙ্গাবাদে অনেক হোটেল, অনেক থাকার জায়গা আছে। শহরটাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওরা কয়েকটা হোটেল ঘুরে ঘুরে গ্রিন পার্ক নামে একটা হোটেল পছন্দ করল। দোতলায় পাশাপাশি দু-খানা ঘর ওদের জন্য। বিরাট লম্বা বারান্দা। ওদের ছুটোছুটি করার পক্ষে ভারি সুবিধে। আর হু-হুঁ করে হাওয়া বইছে।

ঝর্ণা স্নান-টান সেরে বারান্দায় এসে ছোটদের সঙ্গে দাঁড়াল। তারপর সুজয়কে বলল, তোর ওই বন্ধু দুজন ভারি অসভ্য। ফুলগাছটা দেখতে চাইলুম, কিছুতেই দেখতে দিল না। আমি কি ছিঁড়ে ফেলতুম?

সুজয় কোনও উত্তর দিতে পারল না।

ঝর্ণা সুজয়কে আবার জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, লোক দুটোর নাম কি রে?

সুজয় ভাবল, তাই তো, ওদের নাম তো কখনও জিগ্যেস করা হয়নি। ওরাও কখনও বলেনি। আবার দেখা হলে জেনে নিতে হবে।

সুজয় বলল, জানি না।

ঝর্ণা বলল, বলল, নামও জানিস না! তাহলে ওরা তোর বন্ধু হল কি করে?

রাণা এসে বলল, সুজয়ের বন্ধু? কে সুজয়ের বন্ধু?

–ওই যে একটা লম্বা লোক আর বেঁটে লোক একটা!

রাণা বলল, আমি তো তাদের দেখিনি!

খোকন বলল, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ফিমে। লরেল আর হার্ডি তো?

ঝর্ণা বলল, না, না, আজকেই যে অজন্তা পাহাড়ে দেখলাম!

রাণা আর খোকন একসঙ্গে বলল, তারা এরকম কোনও লোক দেখেনি।

সুজয় বেশ বিরক্ত হল ওদের ওপরে। ওরা নিশ্চয়ই দেখেছে সেই প্রথম দিন। ওদের যদি মনে থাকে তো সুজয় কি করতে পারে!

সুজয়ের একবার ইচ্ছে হল, সে ছোড়দিকে সব কথা খুলে বলে। কদিন ধরে সে এমন সব অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য জিনিস দেখছে যে, নিজের মনের মধ্যে আর চেপে রাখতে পারছে না। যা সে দেখছে, তা সব সত্যিই কিনা তাই-ই বা কে জানে।

কিন্তু ছোড়দির সঙ্গে তো তার আগেকার মতন ভাব নেই। ছোড়দি আর তার সঙ্গে আগের মতন গল্পও করে না, ক্যারাম খেলে না। ছোড়দির এখন যত ভাব শুধু কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে। ছোড়দি তার কথা শুনে যদি হাসে?

খোকন আর রাণাকে তো বলাই যাবে না। সুজয়ের সব কথাই অবিশ্বাস করতে চায়। সুজয় কলকাতায় থাকে বলে মনে-মনে ওদের হিংসে আসে কিনা।

একজন কাউকে না বললে সুজয়ের মন কিছুতেই হালকা হবে না। ঠিক আছে, সুজয় আজ থেকে ডাইরি লিখবে। ডাইরির কাছে সবরকম গোপন কথা বলা যায়।

এরপর ওই লোক দু-জনের সঙ্গে দেখা হলে ওদের নাম জিগ্যেস করবে, আর ওদের সব অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জানতে চাইবে।

তবে ওদের সঙ্গে আর তার দেখা হবে কি? এই ক'বার তো হঠাৎ হঠাৎই দেখা হয়েছে।

এর পরের তিনদিন সুজয়রা খুব ঘুরে বেড়াল। ওই লোক দুটির সঙ্গে আর দেখা, হয়নি।

এর মধ্যে কিন্তু খবরের কাগজে দুটো খুব রহস্যময় খবর বেরিয়েছিল। যাদের খবরের কাগজ নিয়মিত পড়ার অভ্যেস আছে, তাদের হয়তো মনে থাকতে পারে।

একটা খবর হল, চম্বল উপত্যকার এগারোজন ডাকাত হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। তারা যেরকম নিষ্ঠুর আর দুর্দান্ত স্বভাবের ডাকাত তাদের পাগল হবার কোনও কারণই নেই। আর এগারোজন ডাকাত একসঙ্গেই বা পাগল হবে কেন, তা কেউ জানে না।

চম্বল উপত্যকায় অনেক ঝোঁপজঙ্গল আর টিলার মধ্যে ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে। পুলিশ বহু বছর চেষ্টা করেও সব ডাকাতকে ধরতে পারেনি। একদিন এই এগারোজন ডাকাত একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, দিনের বেলা। তাদের দেখে গ্রামের লোক ভয় পেয়ে গিয়েছিল সকলেরই হাতে বন্দুক। কিন্তু ডাকাতগুলো মাটিতে আছড়ে পড়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল।

গ্রামের লোক ভয় পেয়ে পুলিশকে খবর পাঠাল। তখন অনেক পুলিশ এসে ডাকাতদের ঘিরে ফেলে উঠে দাঁড়াতে হুকুম করে। ডাকাতগুলো তখনও গোঁ-গোঁ শব্দ করছে-আর তাদের চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে।

পুলিশ তখন সবার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। ডাকাতগুলো তাও কোনও কথা বলে না। পরীক্ষা করে দেখা গেল, সবাই পাগল হয়ে গেছে ওদের গায়ে এখানে সেখানে কিছু পোড়া পোড়া দাগ। যেন হঠাৎ কোনও আগুনের ঝলকানিতে শরীর ঝলসে গেছে। কি করে ওরকম হল–তাও ওরা বলতে পারে না।

ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন যে, হঠাৎ কোনও কারণে ভয় পেয়ে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এ কথাও শুনে ঠিক বিশ্বাস হয় না। ওইরকম দুর্ধর্ষ ডাকাত কী দেখে ভয় পাবে? বাঘ-ভাল্লুক-পুলিশ-কোনও কিছুতেই ওরা ভয় পায় না। ওদের চোখের দৃষ্টিও

খারাপ হয়ে গেছে–তাও বোধহয় ওই আগুনের ঝলকের মতন কোনও কিছুর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য।

পুলিশ জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করে দেখতে পেয়েছে, একটা জায়গায় একটা বিরাট গর্ত। তার পাশেই যে ওই ডাকাতগুলো বসে বসে খাবার খাচ্ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু কি ভাবে অত বড় গর্ত হল, সেখানে কি ছিল–তা কিছুই জানা যায়নি।

আর একটা খবর খুব ছোট। সেটার সঙ্গেই সুজয়রা জড়িত। খবরটা বেরিয়েছিল এইরকম ভাবে : অজন্তা গুহার পাহাড় থেকে একটি মেয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল। সবাই ভেবেছিল মেয়েটি মরেই যাবে। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে একটা গাছের ডালে তার সালোয়ার কামিজ আটকে যায়–সেই অবস্থায় সে পুরো একদিন স্কুলে থেকেও বেঁচে যায়। খবরটার শিরোনাম ছিল–রাখে হরি মারে কে?

আসল ব্যাপারটা কিন্তু একবারে অন্যরকম। ঔরঙ্গাবাদ শহরে সেই ব্যাপার নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছিল।

সেই যে প্রীতমকুমারী নামের মেয়েটি ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল–তিনদিনের মধ্যে তার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। গাছের ডালে আটকে থাকা একেবারে অসম্ভব–পাহাড়ের নিচে দাঁড়ালে ওপর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায় আর পাহাড়ের গায়ে সেরকম কোনও বড় গাছও নেই।

তখন পুলিশ ভেবেছিল, মেয়েটির পড়ে যাওয়ার খবরটাই গুজব। একটা জলজ্যান্ত মেয়ে তো আর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, আর একজন শিখ যুবক, যে ধরা পড়ে স্বীকার করেছে, সে ইচ্ছে করে প্রীতমকুমারীকে নিজের হাতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কয়েকজন লোক সেই দৃশ্য দেখেছে বলেও সাক্ষী দিয়েছে। তাহলে প্রীতমকুমারী কোথায় গেল?

তিনদিন বাদে প্রীতমকুমারীকে পাওয়া গেল সেই অজন্তা পাহাড়ের নিচে, নদীটার থেকে একটুখানি দূরে। সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। প্রথমে ভ্রমণ-বিভাগের একজন লোক তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠতেই প্রীতমকুমারী চোখ মেলে তাকায়। ঠিক যেন ঘুম ভেঙে উঠল।

প্রীতমকুমারীকে নিয়ে আসা হয়েছে ঔরঙ্গাবাদে, রাখা হয়েছে হাসপাতালে। কিন্তু তার চিকিৎসা করার কিছুই নেই, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সে বিশেষ কিছুই বলতে পারছে না। তার শুধু এইটুকু মনে আছে যে, অজন্তা পাহাড়ের ওপরের পাঁচিল থেকে কে যেন তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তখন প্রীতমকুমারী ভয় পেয়ে ভেবেছিল এক্ষুনি মরে যাবে। ভয়ের। চোটে সে পড়তে-পড়তেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর আর তার কিছুই মনে নেই।

এমন হতে পারে, নেহাত সৌভাগ্যের জোরে পাহাড়ের অত উঁচু থেকে পড়েও প্রীতমকুমারীর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যায়নি। সেটা যদিও বিশ্বাস করা যায় না, তবু ধরে নেওয়া হল। কিন্তু এই তিনদিন সে কোথায় ছিল? এই তিনদিন তো তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি?

সমস্ত ঔরঙ্গাবাদ এই আলোচনায় মত্ত। সুজয়রা সবাই এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল বলে তারাও দল বেঁধে হাসপাতালে গেল প্রীতমকুমারীকে দেখতে। সে দিব্যি হাসিখুশি রয়েছে।

বাবা, মা, ছোড়দি সবাই বলাবলি করতে লাগল, এ কি করে সম্ভব? এ কি করে সম্ভব?

সুজয়ের শুধু মনে হতে লাগল, সেই লম্বা আর বেঁটে লোক দুটো নিশ্চয়ই এর কারণ জানে। ওরা নিজেদের মধ্যে আঙুল নেড়ে-নেড়ে এ বিষয়েই কথা বলছিল। সুজয়কে কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু কোথায় সুজয় তাদের খুঁজে পাবে?

.

অজন্তার মতনই ঔরঙ্গাবাদ শহরের খুব কাছেই একটা পাহাড়ে কয়েকটা গুহাতেও অনেক মূর্তি ও ছবি আছে। অজন্তার তুলনায় অনেক কম হলে ও এখানকার শিল্পকলা ভারি চমৎকার। পাহাড়ের অনেকখানি উঁচু পর্যন্ত গাড়ি উঠে যায়, তারপর সামান্য কিছু সিঁড়ি।

অনেকে এই গুহাগুলোর কথা জানে না, না দেখেই চলে যায়। তারা খুব ঠকে। এই গুহাগুলোও খুব অন্ধকার। কোনওদিন আলো ঢোকে না! এত অন্ধকার গুহায় এমন সুন্দর সুন্দর মূর্তি বানিয়েছিল কেন, কে জানে! একটা গুহাতে আয়না দিয়ে দেখতে হয়। আয়নার আলো ফেলে দেখা যায়, নাচের ভঙ্গিমায় কয়েকটি মূর্তি, প্রত্যেকের মুখের ভাব আলাদা। কত যত্ন করে যে এইসব মূর্তি তৈরি করতে হয়েছে।

সেই ঔরঙ্গাবাদ গুহা দেখতে গিয়ে সুজয়ের বাবার সঙ্গে আলাপ হল একজন মিলিটারি কর্নেলের। ঔরঙ্গাবাদে মিলিটারি ক্যানটনমেন্ট আছে, তিনি সেখানেই থাকেন। কর্নেলের নাম চেতন সিং। জাতে রাজপুত। লম্বা চেহারা, টকটকে ফরসা গায়ের রং, চোখের পল্লবগুলো খুব ঘন আর বড়-বড় এবং মস্ত বড় গোঁফ আছে। ছবিতে রাণা প্রতাপের যে-রকম ছবি দেখা যায়, এর সঙ্গে সেই ছবির খুব মিল আছে।

সুজয়ের বাবা কর্নেল চেতন সিং-এর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছিলেন, কিন্তু কর্নেল হেসে বললেন, হামি বাংলা ভালো জানে। হামি কলকাত্তার নজিগে ব্যারাকপুর যো আছে না, সেখানে সাড়ে চার বছর থাকছিলাম তো। ফলওয়ালা দুধওয়ালা ভি হামার বাংলা বাত বোঝে!

কর্নেলের এত ভালো বাংলা শুনে রাণা, খোকন আর সুজয় মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। ঝর্ণা তাদের ধমক দিয়ে বলল, এই, লোকের কথা শুনে অসভ্যের মতন হাসতে নেই।

কর্নেল চেতন সিং বললেন, আপনোগকে পেয়ে ভালোই হল, হামার বাংলা প্র্যাকটিস করে নেব।

কথায় কথায় বাবা বললেন, আপনি সেই পাঞ্জাবি মেয়েটির কথা শুনেছেন?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। কী করে যে সম্ভব! একে মিরাক ছাড়া-কি বলা যায়!

বাবা বললেন, জানেন তো, সেই ঘটনার সময় আমরা অজন্তাতেই ছিলাম। বলতে গেলে আমাদের চোখের সামনে–

কর্নেল বললেন, তাই নাকি? ঠিক-ঠিক কি হয়েছিল শোনান তো!

বাবা উৎসাহ পেয়ে সব ঘটনাটা আবার বলে গেলেন। ছোড়দিও মাঝে-মাঝে। দু-একটা কথা জুড়ে দিচ্ছে। সুজয় পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে আরও অনেক কিছু জানে কিন্তু কিছুই বলল না। বলে কি হবে, এরা তো কেউ বিশ্বাস করে না তার কথায়।

সব শুনে কর্নেল বললেন, আউর একঠো খবর শুনেছেন তো! বোম্বাই থেকে দুইজন ডাক্তার আসছেন প্রীতমকুমারীর জন্য। আর্মির ডাক্তারও পরীক্ষা করছেন।

ওরা একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু প্রীতমকুমারীর তো কোনও জায়গায় কেটে-টেটে যায়নি, হাড়ও ভাঙেনি। তার তো কোনও অসুখ নেই।

কর্নেল বললেন, বেমারি তো কিছু নেই। লেকিন সে মাঝে-মাঝে বড় অদ্ভুত কথা বলে। সে তার ঘরে যেতে চায় না, পাঞ্জাবে ফিরে যেতে চায় না, সে বলে, ওই পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার কাছে থাকবে।

বাবা বললেন, ওই জায়গাটা ওর খুব ভালো লেগে গেছে বুঝি?

ছোড়দি বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর। সবারই থাকতে ইচ্ছে করে।

কর্নেল বললেন, এর থেকে আরও এক আশ্চর্যের কথা আছে। মাঝে-মাঝেই সে চোখে কিছু দেখতে পায় না। চোখ চেয়ে আছে, হাসপাতালের ঘর-লেকিন ও কি বলে জানেন?

ও বলে, শুধু আঁখে দেখছে পাহাড় আর সেই ঝর্ণা। আর বলে, আমি পেড়, আমি পেড়-পেড়কে কি বলে বাংলাতে?

রাণা বলল, গাছ। পেড় মানে গাছ।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই লেড়কি বলে, ও যখন-তখন গাছ হয়ে যায়। তখন ওর দুই পায়ের নিচে খুব ফাইন সুতাকা মাফিক...

বাবা বললেন, মেয়েটি তাহলে পাগল হয়ে গেছে?

কর্নেল বললেন, পাগলের থেকে আরও অনেক বেশি।

স্ট্রেঞ্জ ফেনোমেনান্–

ছোড়দি বলল, বাবা, চলো না আমরা প্রীতমকুমারীকে দেখে আসি।

কর্নেল বললেন, তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। আপলোগ তো যেতে পারবেন না।

ছোড়দি জিগ্যেস করল, আপনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না?

কর্নেল একটু চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা, আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখবে। জরুর খবর পাঠাব আপনার হোটেল মে!

কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা উঠল নিজেদের গাড়িতে। গাড়ি ছাড়ার পর বাবা বললেন, লোকটা বেশ ভালো। ছোড়দি বলল, কি হ্যান্ডসাম দেখতে। সুজয়, রাণা, খোকন বলল, দারুণ, দারুণ!

সেদিন বিকেলবেলাই কর্নেল জিপগাড়ি নিয়ে এলেন হোটেলে। ওরা সবাই দুদ্দাড় করে গাড়িতে উঠতে গেল কিন্তু কর্নেল হেসে বললেন, সরি, ভেরি সরি, ছোটরা যাবে না, ডাক্তারসাহেব অ্যালাউ করবেন না।

ছোটরা নিরাশ হয়ে গেল। সুজয়ের বাবা আর ঝর্ণা চলে গেল কর্নেল সাহেবের সঙ্গে। সুজয়রা উগ্রীব হয়ে রইল।

ওরা ফিরল সন্ধের অনেক পরে। বাবা বললেন, মেয়েটি বোধহয় আর বাঁচবে না।

মা বললেন, সে কি? কেন? বেশ তো ভালো দেখে এলাম সেদিন।

বাবা বললেন, হঠাৎ আবার কি রকম বদলে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা একেবারে অন্যরকম। মানুষের চোখ ওরকম হয় না!

ঝর্ণা বলল, বাবা, ওর গায়ের রংটা দেখেছ?

সুজয়রা দেখেছিল প্রীতমকুমারীর গায়ের রং দুধে-আলতার মতন ফরসা, কিন্তু ঝর্ণা বলল, প্রীতমকুমারীর গায়ের রং কীরকম কালচে সবুজ হয়ে গেছে। সকালবেলাও সে কথা বলছিল মাঝে-মাঝে কিন্তু এখন আর একটা কথাও বলতে পারছে না। চার পাঁচজন ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করছেন কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে পারছেন না।

প্রীতমকুমারী ওদের কেউ হয় না। তবু প্রীতমকুমারীর জন্য ওদের সকলেরই খুব মন খারাপ হয়ে গেল। রাত্তিরে খেতে বসে ওরা শুধু ওই মেয়েটির কথাই আলোচনা করতে লাগল। এরকম রহস্যময় ব্যাপারের কথা ওরা আগে কখনও শোনেনি।

রাত্তিরে শুয়ে-শুয়েও সুজয় প্রীতমকুমারীর কথাই ভাবতে লাগল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার ওপর আবার একটা মশা কানের কাছে পিন-পিন করছে। অন্ধকারে মশাটাকে দেখা যাচ্ছে না বলে মারাও যাচ্ছে না।

সুজয়ের বার বার মনে হচ্ছে, প্রীতমকুমারীর এইরকম অবস্থার সঙ্গে সেই অদ্ভুত লোক দু-জনের কিছু একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু লোক দুটিকে তো তার খুব ভালোই মনে হয়েছিল তারা কি প্রীতমকুমারীর কোনও ক্ষতি করবে? লোক দুটিকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তাও সুজয় জানে না।

মশাটাকে না মারলে আর সুজয়ের ঘুম আসবে না। সুজয় খাট থেকে নেমে আলো জ্বালল। তখন আর দেখা যায় না মশাটাকে। রাণা, খোকন খুব ঘুমুচ্ছে। হোটেলের সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। বারান্দার দরজা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। সুজয় একটা শাল জড়িয়ে বারান্দার দিকে তাকাল।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাতেই সুজয়ের চোখ দুটো একবার যেন একটু জ্বালা করে উঠলো। তারপরই সে টের পেল–সে অন্ধকারের মধ্যেও সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। এমন কি অন্ধকারের মধ্যে যে রাস্তার ওপরের দোকানটার সাইনবোর্ডও পড়তে পারছে অনায়াসে।

সুজয় এখন অবাকও হল না, ভয়ও পেল না। সে বুঝে গেছে, অন্যদের চেয়ে সে অনেক কিছু বেশি দেখতে পায়। লম্বা লোকটিও তাকে বলেছে কয়েক কোটি লোকের মধ্যে এক-একজনের এরকম হয়ে থাকে। তার চোখ খারাপ নয়, বেশি ভালো।

সুজয় আরও একমনে দূরের জিনিস দেখার চেষ্টা করল। দূরের ল্যাম্প পোেস্টটার নিচে একটা ভাঙা পাথর সুজয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আরও দূরে, এমন কি হাসপাতাল এবং ঔরঙ্গাবাদ গুহাও তার চোখে ভেসে উঠছে। মনে-মনে দেখা নয়, চোখে দেখা।

তারপর সুজয় দেখল যে, অনেক দূরে, পাহাড়ের নিচে নিরালা জায়গায় দুটো নীল আলো ঘুরছে। একদৃষ্টে তাকাতে বোঝা গেল, ওখানে সেই দুটো লোক, তাদের গা থেকে সেই ঠান্ডা মতন নীল আলো বেরুচ্ছে। তারা এক জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসল। সেখানে একটি ছোট্ট ফুলগাছ। বেঁটে লোকটি গাছটার সামনে হাত রাখতেই গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুজয় এত উত্তেজিত বোধ করল যে, সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছে না। ওই লোক দুটোর কাছে তাকে যেতেই হবে। সুজয় কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। ছুটতে লাগল অন্ধকার রাস্তা ধরে।

.

সমস্ত ঔরঙ্গাবাদ শহর ঘুমিয়ে আছে, আর অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটছে সুজয়। সুজয়ের কিন্তু একটুও ভয় করছে না। রাস্তা চিনতেও তার অসুবিধে নেই, সে দেখতে পাচ্ছে সব কিছুই। তবে সেই লোক দুটোকে এখন আর দেখা যায় না। হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত, কিন্তু রাস্তায় নেমে অন্য বাড়ির আড়াল পড়ে গেছে। তবু কোন দিকে ওরা আছে, তা সুজয় জানে।

বেশ খানিকক্ষণ ছুটতে ছুটতে সুজয় যখন একটু একটু হাঁপিয়ে গেছে, তখন সে হঠাৎ একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল। বিশেষ কোথাও কাটেনি। দু-পায়ের হাঁটুর কাছে নুনছাল উঠে গিয়ে একটু জ্বালা-জ্বালা করছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার পরই সে দেখল চারিদিকে দারুণ ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। এতক্ষণ সে সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিল, এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

সুজয়ের হয় এরকম। এক-এক সময় সে অন্যদের থেকে অনেক বেশি কিছু দেখতে পায়, কিন্তু সব সময় পায় না। যেন তার একটা আলাদা চোখ আছে, যেটা শুধু মাঝে মাঝে খোলে।

সুজয় খুব করে চোখ আর কপাল রগড়াল, কিন্তু আর কিছুই হল না। অন্ধকারে এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে তার একটু ভয়- ভয় করছে। এই অন্ধকারের মধ্যে সে কি আর রাস্তা চিনে হোটেলে ফিরে যেতে পারবে? সুজয় ঠিক করল, যা হয় হোক, সে ওই লোক দুটিকেই খুঁজতে যাবে।

এমন সময় ঠকঠক করে জুতোর আওয়াজ হল একটু দূরে। কারা যেন আসছে। যারাই আসুক, এত রাত্তিরে সুজয়ের মতন কম বয়েসি ছেলেকে একা-একা রাস্তায় দেখলে তারা নিশ্চয়ই অবাক হবে। আর যদি চোর-ডাকাত হয়? চোর-ডাকাতরাই তো এত রাত্রে বাইরে বেরোয়। কিন্তু তারা কি জুতোয় এত জোর শব্দ করে?

সুজয় একটা দোকানঘরের দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে লুকিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেখল, চোর-ডাকাত নয়, দুজন পুলিশ। হাতে দুটো লম্বা লম্বা লাঠি নিয়ে তারা খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। সুজয়ের খুব কাছাকাছি এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হয় যেন ওদের দু-জনেরই খুব ঘুম পেয়েছে, আর হাঁটতে পারছে না।

ওদের যে-কোনও একজন একটু ঘাড় ফেরালেই সুজয়কে দেখতে পাবে। সুজয়ের বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে।

কিন্তু পুলিশ দুজনের কোনোদিকে তাকাবার মতন মনই নেই। নিজেদের মধ্যে কি যেন গল্প করছে। তারপর একজন খৈনি বার করে সাজতে লাগল, আর একজন জুড়ে দিল গান। সেটা এমনই মজার গান যে, সুজয়ের আর একটু হলেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল। মাঝরাত্তিরে এরকম গান কেউ গায় নাকি?

পুলিশটা গাইছিল :

পাঁচ রুপাইয়া বারা আনা–
মারে গা ভাইয়া নারে নানা–

এই দুটো লাইনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে বরাবর। আর একজনও মাঝে-মাঝে গলা মেলাচ্ছে। তারপর খৈনি মুখে দিয়ে চুপ করল।

একটু পরেই দূরে একটা লরির আওয়াজ শোনা গেল। লরিটা কাছে আসতেই পুলিশ দুজন হাত দেখিয়ে সেটাকে সেটাকে থামাল, একজন টর্চ ফেলল সেটার ওপর। লরিটা একেবারে মালপত্তরে ঠাসা, অনেকখানি উঁচু হয়ে আছে।

পুলিশ দুজন লরির ড্রাইভারকে কি যেন বলতে লাগল। তখন ড্রাইভার কতগুলো খুচরো পয়সা ফেলে দিল। রাস্তার ওপর। তারপরে পুলিশ দুজন সরে দাঁড়াতেই লরিটা চলে গেল। পুলিশরা পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার সেই গানটা গাইতে গাইতে হাঁটতে শুরু করল।

ওরা বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলে সুজয় নেমে এল রাস্তায়। রাস্তাটা শহর ছাড়িয়ে যে-দিকে গেছে, সুজয় সেই দিকটা ধরল। একবার তার মনে হল, রাণা কিংবা খোকন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যদি তাকে না দেখতে পায়, তাহলে নিশ্চয়ই বাবা-মাকে ডাকবে। বাবা-মা ভীষণ চিন্তা করবেন তখন। ওঁরা কি সুজয়কে খুঁজতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন?

আবার সুজয় ভাবল, রাণা আর খোকনের এমন গাঢ় ঘুম যে, রাত্তিরে একবারও ওঠে না। তা হলে কেউ কিছুই জানতে পারবে না।

অন্ধকারে রাস্তা দেখতে না পেলেও সুজয় যেন চুম্বকের টানে একটা বিশেষ দিকে যাচ্ছে। খানিকটা বাদে যে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। সে আশা করছিল, এই রকম হোঁচট খেয়ে যদি তার সেই দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসে তো খুব ভালো হয়। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না।

তবে, একটু বাদেই সে দেখতে পেল মাঠের মধ্যে দুটো নীল রঙের আলো। তখনই সে বুঝতে পারল, সেই লোক দুটোকে খুঁজে পেয়েছে। সুজয় দৌড়োত লাগল।

কাজেই একটা ছোট পাহাড়। তার নিচে এবড়োখেবড়ো মাঠ, দু-চারটে ছোট ছোট গাছও রয়েছে। সেই একটি গাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সেই লম্বা আর বেঁটে লোক দুটি! তাদের গা থেকে আলো বেরিয়েই জায়গাটা বেশ আলো হয়ে আছে।

ওরা খুব মনোযোগ দিয়ে গাছটাকে দেখছিল। সুজয়ের পায়ের শব্দ বোধহয় শুনতে পায়নি। সুজয় এই লোক দুটিকে প্রায় বন্ধুর মতন মনে করে, তাই ওদের দেখে এখন তার একটুও ভয় হয় না।

কাছে এগিয়ে এসে সুজয় উত্তেজিতভাবে ডাকল, এই যে!

সঙ্গে সঙ্গে ওদের গা থেকে আলো নিভে গেল, ওরা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সুজয় একেবারে হকচকিয়ে থ। কি হল! কোথায় গেল ওরা? এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ আবার আলো জ্বলে উঠল, লোক দুটিকে দেখা গেল। তবে, এখন কিন্তু লোক দুটির গা থেকে নীল আলো বেরুচ্ছে না। একজনের হাতে লণ্ঠন, সেটা থেকেই আলো বেরুচ্ছে। কিন্তু সুজয় বাজি ফেলে বলতে পারে, একটু আগে ওদের কাছে লণ্ঠন ছিল না।

সুজয় দৌড়ে এসে লম্বা লোকটির হাত ধরতে যায়। লম্বা লোকটি তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলল, জয়বাবু, আমাকে ছোঁবেন না, ছোঁবেন না!

সুজয় থমকে গিয়ে বলল কেন?

–আমাদের ছুঁতে নেই!

–কেন?

–এমনিই। আপনি এত রাত্তিরে হঠাৎ এখানে এসেছেন কেন?

সুজয় সে কথার উত্তর না দিয়ে জিগ্যেস করল, অপনার এখানে কি করছেন?

–একটা কাজ করছি।

বেঁটে লোকটি একটাও কথা বলেনি, সুজয়ের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। সে গাছটার সামনে এমনভাবে বসে আছে, যেন ঠিক ওটাকে পুজো করছে। অথচ খুবই সাধারণ গাছ, যে কোন মাঠেই দেখা যায়।

বেঁটে লোকটি এমনিতে খুবই হাসিখুশি। কিন্তু এখন তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সুজয়ের হঠাৎ এসে পড়াটা সে পছন্দ করেনি।

সুজয় লম্বা লোকটিকে জিগ্যেস করল, আমি কি এখানে একটু থাকতে পারি?

লম্বা লোকটি বলল, চুপটি করে ওইখানটায় বসুন।

সুজয় বলল, আমাকে সব সময় আপনি বলেন কেন? আমি তো আপনার থেকে অনেক ছোট।

বেঁটে লোকটি দু-হাতের দুটো আঙুল তুলে কি একটা ইশারা করতেই লম্বা লোকটিও আঙুল নেড়ে উত্তর দিল।

বেঁটে লোকটি সেই গাছটার দু-পাশে দুটো হাত রাখল। তারপর এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেদিকে। তখন একটা সাংঘাতিক আশ্চর্য ব্যাপার হল। লোকটির হাতের মধ্যে সেই চারাগাছটা আস্তে আস্তে পাতলা ছায়ার মতন হয়ে গিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে।

সুজয় মুখ দিয়ে অবাক হওয়ার শব্দ করতেই লম্বা লোকটি তার দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল। সুজয় নিজেকে সামলে নিল।

বেঁটে লোকটি সেই অদৃশ্য গাছটার কাছে তখনও দু-হাত মেলে আছে।

আস্তে আস্তে আবার সেখানে গাছটার পাতলা ছায়া দেখা দিল, তারপর পুরো গাছটাই ফিরে এল।

সুজয় শুনেছে, যারা ম্যাজিক দেখায় তারা এসব খুব সহজেই পারে। এই লোক দুটো কি রাতদুপুরে এখানে বসে বসে ম্যাজিক প্র্যাকটিস করছে?

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে বলল, উঁহু! ঠিক হয়নি। তাপর যেন সুজয়ের মনের কথা বুঝতে পেরেই তাকে বলল এটা ম্যাজিক নয়।

বেঁটে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন বেশ রেগে গেছে। সে এবার একটা পাথর তুলে নিয়ে লম্বা লোকটির হাতে তুলে দিল। লম্বা লোকটি সেটি ভালো করে পরীক্ষা করে

ফিরিয়ে দিল বেঁটে লোকটিকে। বেঁটে লোকটি চোখের নিমেষে পাথরটা অদৃশ্য করে ফেলল। তারপরের মুহূর্তেই সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনল হাওয়া থেকে।

লম্বা লোকটি পাথরটা পরীক্ষা করে বলল, এটা ঠিক হয়েছে। গাছটা ঠিক হচ্ছে না কেন?

সুজয় আর থাকতে পারল না। সে মিনতি করে বলল, দেখুন, আপনারা তো অনেক কিছুই পারেন। প্রীতমকুমারীর খুব অসুখ। আপনারা ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন না?

ডালে কাঁপোতা গোনর কথা কেউ বলোকটির হাতে

লম্বা লোকটি বলল, আমরা এখানে সেই চেষ্টাই তো করছি। একটা জিনিস কিছুতেই মিলছে না যে!

সুজয় রীতিমতন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, আপনারা প্রীতমকুমারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? এইখানে বসে?

লম্বা লোকটি খুব সাধারণভাবে বলল, হ্যাঁ। আচ্ছা জয়বাবু, আপনি আমাদের একটু সাহায্য করুন। এই যে গাছটা রয়েছে, গুনে দেখুন, এর কটা ডাল আর প্রত্যেক ডালে কটা পাতা। গুনে মনে রাখতে পারবেন?

গাছের পাতা গোনার কথা কেউ কখনও ভাবে না। অবশ্য এই গাছটা বেশ ছোট। তিনটে মোটে ডাল। অজন্তা পাহাড়ে বেঁটে লোকটির হাতে এইরকমই একটা চারাগাছ দেখেছিল সুজয়। কিন্তু সেই গাছটা আর এটা এক নয়। সেটার পাতাগুলো অন্যরকম, এবং একটা ফুল ছিল।

সুজয় গাছটার পাতাগুলো গুনে ফেলল। লম্বা লোকটি আঙুলের ইশারা করলো বেঁটে লোকটিকে। বেঁটে লোকটি হাত ছুঁইয়ে গাছটাকে অদৃশ্য করে দিল আবার। একটু বাদেই গাছটাকে ফের সেই জায়গায় দেখা গেল।

লম্বা লোকটি বলল, সুজয় বাবু, আপনি এবার গাছের পাতাগুলো গুনুন তো।

সুজয় গুনে দেখল, পাতাগুলো উলটোপালটা হয়ে গেছে। যে ডালে আগে সতেরোটা পাতা ছিল, এখন সেখানে উনিশটা। অন্য ডালে আবার পাতা কমে গেছে।

বেঁটে লোকটি ভীষণ রেগে ভুরু কুঁচকে রয়েছে। লম্বা লোকটি বলল, কিছুতেই হচ্ছে না।

সুজয় বলল, আমাকে এই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেবেন?

লম্বা লোকটি বলল, বললাম না যে এটা ম্যাজিক নয়! ম্যাজিকে কোনও কিছুই অদৃশ্য হয় না। শুধু চোখের ভুল। এটা অন্য ব্যাপার।

–আপনারা কি বৈজ্ঞানিক?

–এটা এমন কিছু বৈজ্ঞানিকদের মাথা ঘামাবার মতন ব্যাপার নয়, খুবই সাধারণ।

–আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?

লম্বা লোকটি সুজয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমাদের সময় খুব কম। এই যে গাছপালা, পাহাড়, জল, লোহা–এগুলোর নাম কি? এগুলোকে বলে ম্যাটার।

সুজয় বিজ্ঞান বইতে এসব পড়েছে বলেই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, এ সবকিছুই ম্যাটার, তার মানে পদার্থ। পদার্থ তিনরকম কঠিন, তরল আর বায়বীয়।

লম্বা লোকটি বলল, বাঃ! এখন এই যে তিনরকম পদার্থ বা ম্যাটারএদের আকৃতি বদলানো যায়। বুঝতে পারলেন?

না।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বরফ একটা কঠিন পদার্থ। সেটা গলে গেলেই জল, মানে তরল পদার্থ। সেই জল খুব গরম করলে বাপ, তার মানে কি যেন বললেন, বায়বী?, সেই বায়বীয় হয়ে যায়। আবার বাষ্পকে ধরে রেখে ঠান্ডা করলে জল হয়, ও জমিয়ে বরফ। বুঝতে পারছেন?

-হ্যাঁ।

–সেইরকম সোনা কিংবা লোহাকেও গলিয়ে তরল করা যায়। তরল থেকে বাষ্প। যে-কোনও জিনিসকেই ভাঙতে ভাঙতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোনো যায়, যার নাম অ্যাটম। সেই অ্যাটমকেও ভাঙলে তখন আর তা বস্তু কিংবা পদার্থ থাকে না, হয়ে যায় শক্তি। পদার্থ থেকে যেমন শক্তি হয়, তেমনি শক্তি থেকেও পদার্থ হয়। এসব এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

সুজয় কিন্তু এখন আর বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে। এইসব কথার সঙ্গে গাছটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কি সম্পর্ক?

সুজয় যখন যা ভাবে, এই লোক দুটি তখনই ঠিক সেই কথা বলে। লম্বা লোকটি আবার বলল, এইসব কথার সঙ্গে গাছটা অদৃশ্য করার সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, গাছটা একটা পদার্থ–সেটাকে শক্তি করে ফেলা খুব সহজ কিন্তু শক্তি থেকে সেটাকে গাছে ফিরিয়ে আনতে গেলে একটু অদলবদল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই গাছটা আর থাকছে না। আমার বন্ধু এই কাজ খুবই ভালো পারে, কিন্তু এসব গাছ তো ওর চেনা নয়!

বেঁটে লোকটি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর একজন কোনও মানুষের ওপর এটা পরীক্ষা করে দেখলে হতো!

লম্বা লোকটি বলল, সেরকম মানুষ কোথায় পাওয়া যায়?

–কেন, এই তো সুজয়বাবুই রয়েছেন। কি সুজয়বাবু, আপনি রাজি?

সুজয় জিগ্যেস করল, আমাকে কি করতে হবে?

–আপনাকে একবার অদৃশ্য করে আবার ফিরিয়ে এনে দেখতে চাই। ঠিকঠাক হয় কিনা।

সুজয় ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত নেড়ে বলল, না, না, আমাকে নয়। আমাকে নয়।

লম্বা লোকটি বলল, একি জয়বাবু, আপনি এই সামান্য ব্যাপারেই ভয় পেয়ে গেলেন?

বেঁটে লোকটি এমন একদৃষ্টে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে আছে যে, তার বুক ঢিপ, ঢিপ করছে। নিজের চোখ আড়াল করে সে প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, আমি মা বাবাকে বলে আসিনি, আমি মরে গেলে মা-বাবা ভীষণ কাঁদবেন।

লম্বা লোকটি বলল, সে কি সুজয়বাবু! আমরা থাকতে আপনি মরবেন কেন? তা কখনো হয়?

–কিন্তু আমি যদি বদলে যাই? মা-বাবা যদি আমাকে চিনতে না পারেন? আমার তো আর ভাই নেই।

–আমরা অনেকবার পরীক্ষা করে দেখব। একবার না একবার ঠিক হবেই।

সুজয়ের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলে। বলল, আপনারা নিজেদের ওপর পরীক্ষা করে দেখুন না! একজন আর একজনকে করুন।

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে জানালো, আমাদের ওপর এ-পরীক্ষা করলে হবে না।

–কেন, আপনারা যখন একজন মানুষ খুঁজছেন!

–আমরা তো মানুষ নই।

সুজয়ের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল। সে ফিসফিস করে বলল, আপনারা মানুষ নন? তা হলে আপনারা কি?

বেঁটে লোকটি ঠাট্টার সুরে বলল, আমরা মানুষ নই। আমাদের বলতে পারেন অ-মানুষ! অ-মানুষ! তারপর সে গ্নে এইরকম হাসির বাড়ি ফিরে

তারপর সে হো হো করে হাসতে লাগল। লম্বা লোকটিও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে। এই রাতদুপুরে এইরকম হাসিঠাট্টার কি মানে হয় রে বাবা!

সুজয়ের মনে হল, এবার তার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। অনেকখানি এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হবে। তবে এখন তার দৃষ্টিশক্তি আবার বেড়ে গেছে, সেইজন্য ভয় করছে না।

সে বলল, আচ্ছা, আপনারা ওই অদৃশ্য করার বিদ্যেটা আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন!

লম্বা লোকটি এবার একটু ধমক দিয়েই বলল, দিয়েছিলাম তো আপনাদের শিখিয়ে। সব ভুলে গেছেন।

–কাকে শিখিয়েছিলেন?

–এদেশের লোকদের। গৌতমকে শেখানো হয়েছিল, তারপর–

–গৌতম কে?

–গৌতম ঋষির নাম শোনেননি? তিনি অহল্যা নামের একটি মেয়েকে পাথর করে দিয়েছিলেন। তারপর রাম এসে সেই পাথর থেকে আবার মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিলেন। এইসবই তো পদার্থ থেকে শক্তি, আবার শক্তি থেকে পদার্থ।

সুজয় বলল, এ তো গল্প!

–মোটেই গল্প নয়। আগেকার দিনে কেউ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে গল্প লিখতে না। এখানকার লেখকরাই বানিয়ে বানিয়ে লেখে।

–এসব তা হলে সত্যি? এসব করতে গেলে কোন যন্ত্রপাতি লাগে না?

–মনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী যন্ত্র আর কিছু আছে? আপনারা নিজের মনকেই তো চেনেন না। একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, আত্মানং বিদ্ধি'–সেটাও ভুলে গেছেন।

সুজয় বলল, আমি এসব কিছু বুঝতে পারছি না। আমি এবার বাড়ি যাই। প্রীতমকুমারী কি তা হলে সারবে না!

লম্বা লোকটি বলল, ওই মেয়েটির বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। যখন ও নিচে পড়ে যায়, তখন ওর শরীর প্রায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল–প্রাণটা তখনও বেরোয়নি বলে আমরা ওকে একটা গাছ বানিয়ে রাখি। গাছ নিজের শরীর মানুষের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিতে পারে। সেরেও গিয়ে ছিল। কিন্তু গাছ থেকে আবার মেয়েতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ও আবার গাছ হতে চাইছে।

বেঁটে লোকটি বলল, প্রীতমকুমারীকে বাঁচাবার জন্য আর একবার চেষ্টা করে দেখি না! শেষ চেষ্টা।

লম্বা লোকটি বলল, চলো, যাওয়া যাক।

সুজয় বলল, আপনারা সেখানে কি করে যাবেন? সেখানে এখন খুব কড়া পাহারা। আমাদের যেতে দেয়নি। বাবা আর ছোড়দি শুধু গিয়েছিল কর্নেল সাহেবের সঙ্গে।

ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে আঙুলের ইশারায় কি কথা বলে নিল। তারপর সুজয়ের দিকে ফিরে লম্বা লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনি তাহলে এখন বাড়ি যান! রাস্তা চিনে যেতে পারবেন তো?

–আপনারা এখন কোথায় যাবেন?

–ওই মেয়েটির কাছে যাব।

–কিন্তু বললুম যে, খুব কড়া পাহারা।

–কড়া পাহারা দিয়ে কি মৃত্যুকে আটকে রাখা যায়? ওই মেয়েটি তো একটু বাদেই মরে যাবে। আমরা গেলে তবু বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি।

সুজয় বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?

লম্বা লোকটি বলল, আপনি গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে!

বেঁটে লোকটি ঠাট্টা করে বলল, তাছাড়া জয়বাবু, আপনি যে বড্ড ভীতু!

এই কথাটা সুজয়ের মনে লাগল। ভীতু বললে কার না খারাপ লাগে?

সুজয় অভিমানের সঙ্গে বলল, আমি মোটেই ভীতু নই! আমি অন্ধকার রাস্তা দিয়ে এতখানি দৌড়ে এসেছি, আর কোনও ছেলে পারবে?

–কিন্তু আপনাকে যখন বললুম, আপনাকে অদৃশ্য করে দিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখব, তখন আপনি ভয় পেলেন কেন?

–বাঃ, আপনারা কেন নিজেদের ওপর পরীক্ষা করছেন না? তার মানে আপনারাও ভয় পাচ্ছেন। সেবেলা বুঝি কিছু হয় না?

বেঁটে লোকটা হাসতে হাসতে বলল, আমরা নিজেদের ওপর পরীক্ষা করব? আচ্ছা, এই দেখুন!

বেঁটে লোকটি লম্বা লোকটির দিকে দু-হাত তুলে তাকাতেই লম্বা লোকটি চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত বাদে লোকটি নিজের জায়গায় ফিরে এল। এবার সে বেঁটে লোকটির দিকে দু-হাত তুলে তাকাতেই বেঁটে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সে ফিরে এল নিজের জায়গায়। তখন সে আবার লম্বা লোকটির দিকে হাত তুলে

এই রকম তিন-চার বার চলল। একজন আর একজনকে অদৃশ্য করে দিচ্ছে। সুজয় বড় বড় চোখ মেলে দেখছে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। অথচ চোখের সামনেই তো হচ্ছে এসব। সুজয়ের গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ঘাম বেরুচ্ছে এই শীতের মধ্যেও। অথচ ঠিক ভয় পাচ্ছে না সে।

লম্বা লোকটি বলল, দেখলেন তো? কিন্তু আমাদের ওপর এই পরীক্ষা করে লাভ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের চেয়ে আমরা একটু আলাদা। আমাদের গায়ে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। আর আমরা আলো শুষে নিতে পারি বলে আমাদের শরীরের ছায়া পড়ে না। এই দেখুন না, চাঁদের আলোয় আপনার একটা ছায়া পড়েছে। কিন্তু আমাদের কি ছায়া আছে?

সুজয় দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনাদের ছায়া পড়ে না? তা হলে আপনারা কি দেবতা? আমি বইতে পড়েছি, দেবতাদের গা থেকে রক্তও পড়ে না, ওঁদের কখনও ছায়াও পড়ে না।

বেঁটে লোকটি জিগ্যেস করল, দেবতা কি?

সুজয় বলল, বাঃ, আপনারা কি দেবতার কথা জানেন না? ব্রহ্মা,বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র। বাবা বলেছেন, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ-এরাও দেবতা!

লম্বা লোকটি বলল, না, আমরা দেবতা নই। আমরা অন্য গ্রহ থেকে এসেছি অনেক দূর থেকে।

–সত্যি?

-হ্যাঁ, সত্যি। আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানে মিথ্যে বলে কিছু নেই। পৃথিবীর মানুষই শুধু মিথ্যে কথা বলে।

কিন্তু বাবা যে বলেছেন, পৃথিবী ছাড়া আর অন্য কোনও গ্রহে মানুষ কিংবা প্রাণী নেই! বাবা মিথ্যে কথা বলেছেন?

-না, আপনার বাবা হয়তো জানেন না। আমরা এসেছি অনেক দূর থেকে -আপনাদের আকাশে যে-রকম সূর্য আছে, এরকম অনেকগুলি সূর্য পার হয়ে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সুজয় জিগ্যেস করল, কিন্তু সেদিন যে কুকুরটা আপনার পায়ে কামড়ে দেবার পর আপনারা পা দিয়ে খুব রক্ত পড়েছিল!

-সে তো আপনি রক্তের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি রক্ত তৈরি করে ফেললাম।

-এরকম যা খুশি তৈরি করতে পারেন?

-কিছুই শক্ত নয়। দেখবেন, আমার পায়ে কুকুর কামড়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে একটুও দাগ নেই?

লোকটি একটা পা মেলে দিল সুজয়ের সামনে। কাপড়টা সরাতেই দেখা গেল মসৃণ সুন্দর চামড়া। অত জোরে কুকুর কামড়ে দিলে ঘা হবেই যে-কোনও লোকের। এর কিছুই হয়নি। এর পায়ে একটুও লোম নেই-ঠিক যেন আয়নার মতন ঝকঝকে গা।

বেঁটে লোকটি বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! এক্ষুনি না গেলে মেয়েটিকে বাঁচানো যাবে না।

লম্বা লোকটি বলল, আচ্ছা, এসব কথা পরে হবে। এখন যাওয়া যাক।

বেঁটে লোকটি চোখের দিকে তাকালেই সুজয়ের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সাহস এনে সে বলল, তা হলে প্রীতমকুমারীকে বাঁচাতে পারবেন?

–চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

–আচ্ছা, তা হলে করুন।

বেঁটে লোকটি একদৃষ্টিতে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে দুটো হাত তুলতেই সুজয়ের দেহটা হালকা ছায়ার মতন হয়ে গেল। তারপর একেবারে অদৃশ্য।

অদৃশ্য অবস্থায় কি কি হয়েছিল তা সুজয়ের মনে নেই। তখন তার চোখ ছিল না বলে কিছুই দেখতে পায়নি। তার মাথা ছিল না বলে কিছু মনেও রাখতে পারবার উপায় নেই!

শুধু নির্জন মাঠে জ্যোৎসার মধ্যে যেখানে সুজয় লোক দুটির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, এখন সেখানে সে নেই। এখন সেখানে চাঁদের আলো পড়ে আছে, ছায়াটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশে হালকা সাদা সাদা মেঘ। এক এক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদকে।

বেঁটে লোকটি একরকম ভাবে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। এত জ্বলজ্বলে চোখ কোনও মানুষের হয় না। মনে হয় যেন চাঁদের খানিকটা আলোও সে চোখ দিয়ে শুষে নিয়ে আবার বার করে দিচ্ছে।

লম্বা লোকটিও এক পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে একটা টুসকি দিল। বেঁটে লোকটা আবার হাত দুটো ওঠা-নামা করাতেই ফিরে আসতে লাগল সুজয়।

প্রথমে ধোঁয়া ধোঁয়া, তারপর হালকা কাঁচের মতন, তারপর পুরোপুরি তার আগেকার চেহারা।

সুজয় চোখ বুজে আছে। চোখ খুলতেই তার কিরকম যেন মাথা ঘুরে গেল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

লোক দুটি দৌড়ে এল তার খুব কাছে, ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু সুজয়ের গা-ছুঁলো না। দু-জনেই ব্যস্তভাবে ডাকল, সুজয়বাবু, সুজয়বাবু!

সুজয় আবার চোখ বুজে আছে।

লম্বা লোকটি হাততালি দিয়ে খটখট করে শব্দ করতে লাগল।

সুজয় চোখ মেলে বলল, আমি কোথায়?

লম্বা লোকটি বলল, এই যে আপনি এখানে। আমাদের সামনে। এখানেই তো ছিলেন।

–আমি কে?

–আপনারা নাম তো সুজয়! জয়বাবু, আপনার কিছু মনে পড়ছে না?

সুজয় দুদিকে ঘাড় নেড়ে জানালনা।

–ভালো করে মনে করার চেষ্টা করুন।

–পারছি না। কিছুই মনে পড়ছে না।

বেঁটে লোকটি বলল, হাত পা মুখ সবই তো ঠিক আছে।

লম্বা লোকটি বলল, মাথাটা একটু ছোট মনে হচ্ছে না?

বেঁটে লোকটি বলল, না। ঠিকই তো আছে। শরীরটা ঠিকই আছে। কিন্তু ওদের গায়ের ভেতরে যে রক্ত থাকে–সেই রক্ত একটু অদলবদল হলেই মুশকিল–

লম্বা লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনি মনে করার চেষ্টা করুন, আপনি আপনার বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন। আপনার দিদি আছেন সঙ্গে আপনি হোটেল থেকে রাত্তির বেলা–

সুজয় বলল, না, না, আমার নাম আবদুল মালেক, আমার খুব অসুখ হয়েছিল–

–সে কি?

–আমাকে ইঞ্জেকশান দিচ্ছিল ডাক্তারবাবু।

বেঁটে লোকটির মুখ চিন্তায় কুঁকড়ে গেল। খুব নিচু গলায় বলল, একটা কিছু ভুল হয়েছে–

সে আবার হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে বলল, জয়বাবু, আমার দিকে তাকান! আবার তাকান!

সুজয় হাত দিয়ে নিজের চোখ আড়াল করে বলল, পারছি না। আমার চোখে লাগছে। এত আলো কেন?

বেঁটে লোকটি বলল, হাত সরিয়ে নিন, চোখে লাগবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে!

বেঁটে লোকটি খুবই উত্তেজিত। এখন তার গা থেকে নীল আলো বেরুতে শুরু করেছে। সুজয় চোখ থেকে হাত সরাতেই সে সুজয়কে আবার চোখের নিমেষে অদৃশ্য করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু এবার আর সে সুজয়কে ফিরিয়ে আনল না! প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ওই একভাবে। এখন তাকে দেবতা বা অলৌকিক কিছু মনে হয়।

আবার সুজয় ফিরে এল সেই জায়গায়। এবার কিন্তু সে চোখ মেলেই ধড়ফড় করে উঠতে গেল। সুজয়ের মতন গলায় নয়, অন্যরকম, বয়স্ক লোকদের মতন গম্ভীর গলায় বলল, এসব কি ব্যাপার?

লম্বা লোকটি বলল, সুজয়বাবু, এবার সব ঠিক আছে?

সুজয় ভুরু কুঁচকে বলল, সুজয় আবার কে?

–আপনার নাম সুজয়। আপনার ডাকনাম জয়।

-কি বাজে কথা বলছেন? আমার নাম পরিতোষ। আপনারা সুজয়ের কথা কি বলছেন? তার কি হয়েছে?

মাটিতে যে শুয়ে আছে, সে সুজয়ের মতনই ঠিক দেখতে। সেই জামাপ্যান্ট পরা, কিন্তু গলার আওয়াজ বড়দের মতন-অন্য একজন লোক কথা বলছে তার ভেতর থেকে।

লম্বা লোকটি আর বেঁটে লোকটি চোখাচোখি করল। আঙুলের ইশারা করে আবার কি বলাবলি শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনারা কে? আমি এখানে কি করে এসেছি? সুজয়ের কথা আপনারা কি বলছিলেন?

লম্বা লোকটি বলল, সেসব কথা পরে হবে। আপনি সুজয়কে চেনেন?

-কেন চিনবো না। সুজয় তো আমার দিদির ছেলের নাম! আমার ভাগ্নে হয়। কি হয়েছে তার?

বেঁটে লোকটির চোখ-মুখে হঠাৎ হাসি ছড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণে মনে হল, সে যেন খুব খুশি হয়ে উঠেছে। সে বলল, যাক, আর ভয় নেই।

লম্বা লোকটি বলল, কি?

অনেকটা মিলে এসেছে। একই পরিবারের রক্ত হয়ে এসেছে যখন, তখন আর দেরি হবে না। এই রক্তই যত গোলমাল করে।

মাটিতে শুয়ে থাকা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, পরিতোষবাবু, একবার আমার চোখের দিকে তাকান তো! তারপর হাত উঁচু করেই সে ওই শরীরটা অদৃশ্য। করে ফেলল।

এবার সুজয়ের চেহারাটা যখন ফিরে এল, তখন তার চোখ খোলা। সে লম্বা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, সব ঠিক আছে?

লম্বা লোকটি খুব নরম গলায় জিগ্যেস করল, আপনার নাম কি সুজয়? আপনি কি আমাদের জয়বাবু?

সুজয় বলল, বাঃ, আমার নাম আবার বদলে যাবে নাকি এর মধ্যে? আমাকে কি আপনারা সত্যি অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি? খালি মনে হচ্ছে, আমি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম!

লম্বা ও বেঁটে লোক দুটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বড়-বড় নিঃশ্বাস ফেলল।

বেঁটে লোকটি বলল, উঃ, যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন! তাও তো আপনাকে গাছ বা অন্য কিছু করিনি!

সুজয় বলল, আপনাদের পরীক্ষা ঠিক হয়েছে তো? আমি কি ভয় পেয়েছি একটুও, বলুন?

–না, আপনি একটুও ভয় পাননি।

লম্বা লোকটি বলল; চলুন এবার দেখা যাক মেয়েটিকে বাঁচানো যায় কিনা!

এত রাত্রেও হাসপাতালের সামনের গেটে বেশ কিছু লোকজন, গাড়ি ও আলো। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে কয়েকজন লোককেও ছুটোছুটি করতে দেখা গেল। প্রীতমকুমারীয় জন্য সবাই দারুণ ব্যস্ত, তার অবস্থা খুবই খারাপ। মহারাষ্ট্রের গভর্নর নিজে তিনবার টেলিফোন করেছেন খবর জানবার জন্য। দিল্লি থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রীতমকুমারীকে যে-কোনও প্রকারে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক। সমস্ত দেশের বড় বড় ডাক্তারদের একটা দলকে দু-একদিনের মধ্যেই পাঠানো হচ্ছে এখানে। প্রীতমকুমারীর একটা পা শুকিয়ে অবিকল গাছের ডালের মতন হয়ে গেছে!

লোক-দুটির সঙ্গে সুজয় হন হন করে দোতলায় উঠে এল। প্রীতমকুমারীকে কোন্ ঘরে রাখা হয়েছে, সে জানে। লোক দুটিও মনে হল জানে, কেননা তারা সুজয়কে একবারও জিজ্ঞেস না করেই এগুতে লাগল- ডানদিকের কোণের ঘরটার দিকে।

এই সময় কর্নেল চেতন সিং বেরিয়ে এলেন ওই ঘরটা থেকে। খুব ব্যস্তভাবে হেঁটে যাচ্ছিলেন সিঁড়ির দিকে। সুজয়কে দেখতে পাননি।

সুজয় দৌড়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কর্নেলসাহেব, কর্নেলসাহেব, শুনুন–

কর্নেল প্রথমে সুজয়কে চিনতে পারলেন না। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, ও সেই বাঙালিবাবু! এত রাতমে এখানে কি করছো?

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলল, এই যে এঁরা দুজন, এঁরা প্রীতমকুমারীকে সারিয়ে দেবেন।

কর্নেলসাহেব বললেন, ননসেন্স! এখন বিরক্ত করো না! খুব সাংঘাতিক ব্যাপার–

আপনি ভালো করে শুনুন। এঁরা দুজন–

কর্নেলসাহেব সুজয়ের কথা পুরোটা না শুনেই বললেন, খোকাবাবু, এখন বাড়ি যাও–

লোক দুটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। লম্বা লোকটি এবার এগিয়ে এসে খুব বিনীতভাবে বলল, আমাদের একবার ভেতরে যেতে দিন।

লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে কর্নেল যেন একটু চমকে গেলেন। দু-তিনবার তাকালেন। তারপর রুক্ষভাবে ইংরেজিতে বললেন, আপনারা কি? হেকিম না কবিরাজ, না সাধু? মন্তর দিয়ে সারাবেন? ওখানে সাতজন বড়-বড় ডাক্তার রয়েছেন

লোকটি কর্নেলের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আবার সেই কথা বলল, আমাদের একবার ভেতরে যেতে দিন!

–এখন বিরক্ত করবেন না। আপনারা চলে যান এখান থেকে।

–আমাদের একবার ভৈতরে যেতে দিন।

কর্নেলসাহেব এমনিতে বেশ হাসিখুশি ভালো মানুষ। কিন্তু আজকের নানানরকম ঘটনায় তার মেজাজ ঠিক নেই। হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, গেট আউট! যত সব হাতুড়ে! আপনারা যাবেন, না তাড়িয়ে দিতে হবে?

তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, অডার্লি–অডার্লি!

লোক দুটি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ আসছে না দেখে, রাগের চোটে কর্নেলসাহেব নিজেই ওধের ঘাড়ধাক্কা দিতে এলেন। কর্নেল যাও' বলে সেই লম্বা লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গেলেন, অমনি সে দু-হাত উঁচু করলো। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল কর্নেল।

বেঁটে লোকটি বলল, চলো এবার ভেতরে যাওয়া যাক।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সুজয়ের মনে হল, প্রীতমকুমারী আর বেঁচে নেই। কেন যে তার মনে হল, সে জানে না। তখনও সে প্রীতমকুমারীকে দেখতে পায়নি। তবু তার মনে হল তারা ঠিক এক মুহূর্ত দেরি করে এসেছে।

সত্যিই তাই। তারা দরজা খোলার ঠিক আগের মুহূর্তেই প্রীতমকুমারীর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে।

ঘর-ভর্তি ডাক্তার আর নার্স। প্রীতমকুমারীর নাকে অক্সিজেনের নল। আরও কত রকম যন্ত্রপাতি। তিনজন ডাক্তার প্রীতমকুমারীর কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ছিলেন। এবার মুখ তুলে ইংরেজিতে বললেন, সব শেষ। অবিশ্বাস্য! অলৌকিক! ক্যামেরাম্যানদের ডাকুন।

প্রীতমকুমারীর হাত-পাগুলো ঠিক গাছের ডালের মতন রং ধরে শুকিয়ে গেছে। মুখখানা সবুজ।

সুজয় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, সেই লোক দুটি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেঁটে লোকটির মুখ দু-হাতে ঢাকা। মনে হয় যেন কাঁদছে।

সুজয় বুঝতে পারল, ঘরের অন্য সব ডাক্তাররা যাতে ওদের মনে করে প্রীতমকুমারীর আত্মীয়, দুঃখ পেয়ে কাঁদছে–তাই বেঁটে লোকটি ওইরকম ভান করছে। দারুণ চালাক তো!

লম্বা লোকটি নিচু গলায় বলল, আমরা এখানে থেকে আর কি করব! চলো–

সুজয়ও ওদের সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কেউ কোনও কথা বলল না। বাইরে বেরিয়ে আসার পরল সুজয় দেখল, বেঁটে লোকটি সত্যিই কাঁদছে তখনও। তার দু-চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। লম্বা লোকটির চোখেও ছলছল ভাব।

সুজয় বেশ অবাক হয় গেল। একটু আগে সে ওদের দেবতা ভেবেছিল। দেবতাদের ছায়া পড়ে না। গা থেকে রক্ত পড়ে না। কিন্তু চোখ দিয়ে কি জল পড়ে? দেবতাদের কান্নার কথা কি সে কোথাও পড়েছে? এই লোকটির কান্না কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন?

বেঁটে লোকটি ধরা গলায় বলল, আমি মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলাম না!

প্রীতমকুমারী তো ওদের আত্মীয় নয়, কেউ নয়। প্রীতমকুমারী যে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল, তাতেও ওদের কোনও দোষ নেই। তবু ওই মেয়েটির জন্য ওরা কাঁদছে –এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। সুজয়েরও মনে খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে তো জল পড়ছে না।

সুজয় কিন্তু সে কথা বলল না। সে বরং জিগ্যেস করল, আপনারা তো ওকে বাঁচাবার কোনও রকম চেষ্টাই করলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বেঁটে লোকটি চোখ মুছে বলল, একবার প্রাণ বেরিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। প্রাণ থাকলে অদলবদল করা যায়, কিন্তু প্রাণই যদি না থাকে–

লম্বা লোকটি বলল, এখানে এরা তো এখনও ঠিকমতন বাঁচাতে জানে না। তাই এত লোক মরে।

বেঁটে লোকটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দেবার মতন সুরে বলল, আগে আমরা প্রাণ তৈরি করতে পারতাম। খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না কিন্তু ক'বছর আগে থেকে আমাদের ওখানে প্রাণ তৈরি করা নিষেধ হয়ে গেছে। ওটা আবার আমরা প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

সুজয় জিগ্যেস করল, ক'বছর আগে থেকে।

লম্বা লোকটি উত্তর দিল, আপনাদের হিসেবে এই ধরুন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে।

সুজয় আর সেই লোক দুজন কিছুক্ষণ হাঁটতে লাগল চুপচাপ। সুজয়ের মনের মধ্যে একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। কোনটা আগে জিজ্ঞেস করবে, সেটাই ঠিক করতে পারছে না। বার বার তার মনে হচ্ছে, কি যেন একটা জরুরি কথা এক্ষুনি বলা দরকার। যদিও প্রীতমকুমারীর মুখখানাই তার চোখের সামনে ভাসছে–তবুও এর থেকেও বেশি জরুরি আর একটা কি যেন ব্যাপার আছে। অথচ ঠিক মনে পড়ছে না।

রাত আর বেশি নেই। কোথা থেকে ডেকে উঠল একটা কুকুর। একটা গাছে কয়েকটা পাখির ঝটপটানি শোনা গেল। তিন রাস্তার মোড়ে এসে লম্বা লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনি এবার যেতে পারবেন তো? আমাদের এবার অন্যদিকে যেতে হবে।

সুজয় জিগ্যেস করল, আপনারা কোথায় যবেন?

লম্বা লোকটি বলল, আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে।

মা-বাবা হঠাৎ জেগে উঠলে সুজয়কে খোঁজাখুঁজি করবেন। চিন্তা করবেন খুব। তবু সুজয়ের এক্ষুনি বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। এই লোক দুটির সঙ্গে যদি আর কখনও দেখা না হয়, তাহলে সে অনেক কথাই জানতে পারবে না।

সুজয় বলল, আপনারা যদি প্রীতমকুমারীকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে সবাইকে আমি বলতাম যে, আমার জন্যই সে বেঁচে গেছে। আমি আপনাদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম তো!

বেঁটে লোকটির মুখ দেখে মনে হল, আবার কেঁদে ফেলবে। প্রীতমকুমারীর জন্য ওর সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে। ধরা গলায় বলল, চেষ্টা তো কম করিনি। পাহাড় থেকে পড়ে যাবার পরই সে মরে যেত। তবু তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। ওকে আরও অনেকদিন গাছ করে রেখে দিলে হয়তো কাজ হতো। কিন্তু তাতে ওর স্মৃতিশক্তি অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো। ও আর মানুষ চিনতে পারতো না।

–সেও তো ভালো ছিল।

–না, তার ফল ভালো হয় না। সেরকম বেঁচে থেকে লাভ নেই।

–আপনারা আগে মরা মানুষ বাঁচাতে পারতেন তো। ইচ্ছে করে সেটা ভুলে। গেলেন?

–শুধু মরা মানুষ বাঁচানো নয়। প্রাণও তৈরি করতে পারতাম। যেমন ধরুন, ইচ্ছে করলেই আপনার মতন একটি ছেলেকে এই মুহূর্তে তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু নিয়ম করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে সময়ের হিসেব থাকে না।

–তার মানে?

–সেটা আপনি ঠিক বুঝবেন না। সকলেই যে-এক সময় জন্মায় ও মরে। তাই দিয়েই সময়ের হিসেব হয়।

সুজয় লম্বা লোকটির দিকে ফিরে বলল, আপনি যে বললেন, আপনাদের অনেক কাজ বাকি আছে? আপনারা তো বাইরে থেকে এসেছেন? এখানে আপনাদের কি কাজ?

লম্বা লোকটি হেসে বলল, অনেক কাজ। যেমন ধরুন, কাল বিকেলবেলা একটা ঝড় তুলতে হবে এখানে। আপনাকে আগে থেকেই বলে দিলাম, কাল বিকেল ঠিক সাড়ে চারটের সময় ধারুণ ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হবে এখানে। এরকম ঝড় এখানে বহুদিন হয়নি।

–আপনারা ঝড় তৈরি করবেন?

–হ্যাঁ। এই সময় তো সাধারণত ঝড় বৃষ্টি হয় না। আমরা তৈরি না করলে আর কি করে হবে বলুন!

–কেন, ঝড়বৃষ্টির দরকার কি?

–প্রীতমকুমারীর জন্য। প্রীতমকুমারী যেভাবে মারা গেছে, এর আগে আপনাদের এখানে আর কেউ মারা যায়নি। মরার পর কেউ তো গাছ হয়ে যায় না। এই নিয়ে খুব হই-চই হবে। সেটাকে চাপা দেবার জন্যই ঝড়বৃষ্টি চাই। ঝড়বৃষ্টিতে লোকে নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, অন্য কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না।

বেঁটে লোকটি বলল, আপনাদের এখানে এই তো নিয়ম দেখছি। নতুন একটা কিছু ঘটলেই লোকে পুরোনো কথাটা ভুলে যায়।

–আপনারা এরকম ঝড় ইচ্ছে করলেই তৈরি করতে পারেন?

–মাঝে-মাঝে করতে হয়। কাল বিকেলে আমাদের একটা রকেট এখানে নামবে। ঝড়বৃষ্টিতে কেউ দেখতে পাবে না।

সুজয় জিগ্যেস করল, সেই রকেটে কি আপনারা চলে যাবেন?

লম্বা লোকটি বলল, ঠিক নেই। যেতেও পারি।

–আপনাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না?

–আপনি দেখা করতে চান বুঝি? আমাদের আপনি পছন্দ করেছেন?

সুজয় কীভাবে বুঝিয়ে বলবে জানে না। এই লোক দুটির সঙ্গে আর দেখা হবে, তা কি হয়? সে আবদারের সুরে বলল, না, আপনারা কালকে কিছুতেই যেতে পারবেন না।

বেঁটে লোকটি বলল, আমরা তো প্রায়ই আসি। যখনই দেখবেন পৃথিবীর কোনও জায়গায় খুব বেশি ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, সে সময়ই বুঝবেন, আমাদের রকেট নেমেছে। এমনি অন্য সময় যদি রকেট নামে–তা হলে তার কাছাকাছি মানুষজন থাকলে তাদের চোখ ঝলসে যায়। কিছুদিন আগেই এইরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। দশ-এগারো জন লোকের চোখ ঝলসে গেছে–

লম্বা লোকটি বলল, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করিনি, কারণ খবর নিয়ে জানলুম তারা ডাকাত।

বেঁটে লোকটি বলল, মানুষের মধ্যে আমরা ঘোরাফেরা করলেও কেউ আমাদের চিনতে পারে না। আপনি চিনতে পেরেছেন, কারণ আপনার চোখটা অন্যরকম।

লম্বা লোকটি বলল, আরও দু'একজন চিনতে পেরেছে। ফরাসি দেশে একজন লোকের চোখ আপনার মতন। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি–লোকে তাকে পাগল ভেবেছে।

বেঁটে লোকটি বলল, আপনিও যেন আমাদের কথা কারুকে বলবেন না। তাহলে সবাই পাগল বলবে কিন্তু।

হঠাৎ উত্তেজনায় সুজয়ের চোখ-মুখ লাল হয়ে এল। সেই জরুরি কথাটা মনে পড়ে গেছে। সে চিৎকার করে বলল, সেই কর্নেল? সেই কর্নেলের কি হল?

বেঁটে লোকটি বলল, কর্নেল? সে আবার কে?

–হাসপাতালে যাকে আপনারা অদৃশ্য করে দিলেন?

লম্বা লোকটি খুব গম্ভীরভাবে বলল, সেই লোকটি খুব খারাপ কাজ করেছিল, সে আমার গায়ে হাত দিতে এসেছিল।

বেঁটে লোকটি বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন তো, আমরা এখানে কোনও মানুষের গা-ছুঁই না।

সুজয় বলল, কর্নেলকে মেরে ফেলবেন না। ওকে বাঁচিয়ে দিন।

লম্বা লোকটি বলল, না, না, মারবো কেন? আমার গা-ছুঁয়ে ফেললেই বরং তাকে বাঁচানো যেত না। সুজয়বাবু, আপনি চোখ বুজুন। এবার হাসপাতালটার কথা ভাবুন। –কি দেখছেন?

সুজয় দেখল, হাসপাতালের দোতলার সিঁড়ির কাছে কর্নেল সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ বোজা। ঠিক যেন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন। দু-তিনজন লোক অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

সুজয় চোখ খুলতেই বেঁটে লোকটি বলল, সব ঠিক আছে তো?

সুজয় বলল, হ্যাঁ।

লম্বা লোকটি বলল, এবার আমরা চলি!

সঙ্গে সঙ্গে তারা হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। সুজয় তাদের আর কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ পেল না।

.

সুজয় হোটেলে ফিরে দেখল তখনও কারুর ঘুম ভাঙেনি। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সিঁড়ি দিয়ে সে পা টিপে টিপে ওপরে উঠল। আস্তে-আস্তে নিজের ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখল, রাণা আর খোকন তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুজয় খাটে ওঠার সময় একটা কাঁচ করে শব্দ হল, তাতেও ওরা জাগল না। চাদরটা গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল সুজয়।

সেই যে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই আর তার ঘুম ভাঙে না। রাণা আর খোকন। বার বার তাকে ডাকাডাকি করল, সুজয় চোখই খোলে না। মা এসে বললেন, এই জয়, ওঠ ওঠ। খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সুজয় ঘুমের ঘোরে বলল, আমি খাব না।

ঝর্ণা এসে বলল, খাবি না, খাবি না! উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে নে। সকালে একটু বেড়াতে বেরুব। আজ বিকেলেই আমাদের জলগাঁও ফিরতে হবে।

সুজয় চোখ বুজেই বলল, আজ আমাদের ফেরা হবে না।

আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সবাই অবাক। সুজয় তো কোনওদিন এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না। সে বরং ভোরে ওঠে সকলের আগে।

মা বললেন, আচ্ছা আর একটু ঘুমোক। ন'টার সময় ডাকলেই হবে।

ঝর্ণা কিন্তু খুব কড়া। সে বলল, কেন ঘুমোবে, এতক্ষণ ঘুমন খুব খারাপ অভ্যেস!

ঝর্ণা খানিকটা জল এনে ছিটিয়ে দিল সুজয়ের মুখে। খোকন ওর পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

সুজয় তবু জাগলো না, আঃ বলে পাশ ফিরে শুলো।

তখন রাণা আর খোকন দুদিক থেকে দুহাত ধরে ওকে টানতে টানতে তুলল বিছানা থেকে। হাঁটিয়ে নিয়ে এল বারান্দায়। সুজয় ওদের সঙ্গে হাঁটছে বটে, কিন্তু চোখ খুলছে না।

ঝর্ণা এবার বকুনি দিয়ে বলল, এই, কি হচ্ছে কি? বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

সুজয় বলল, আমার চোখ জ্বালা করছে, চোখ খুলতে পারছি না।

মা অমনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেন, চোখে কি হয়েছে? দেখি তো!

চোখ খোলার পর দেখা গেল, সুজয়ের চোখ দুটো সত্যিই খুব লাল। অনেক জলের ঝাঁপটা দিয়ে খানিকটা ঠিক হল। ঝর্ণা বলল, এবার কলকাতায় ফিরে মা তুমি সুজয়কে কোনও চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও। ও বরাবরই চোখে একটু কম দেখে।

এই কথা শুনে সুজয় মনে-মনে হাসল। সে চোখে মোটেই কম দেখে না, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দেখে। কোনো ডাক্তারই সেটা বুঝতে পারবে না।

কাল রাত্তিরে যে সুজয় বাইরে বেরিয়েছিল সে-কথা কারুকে বলল না। বাবা, মা ছোড়দি তা হলে ভীষণ বকবেন। কিন্তু দুপুরবেলাতেই সব জানাজানি হয়ে গেল।

বাবা ঠিক করেছেন, সেদিন বিকেলেই জলগাঁও ফিরবেন। সেই জন্য সকালের দিকে সবাই আর একবার ইলোরার দিকে বেড়াতে যেতে চায়। তাছাড়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধিটাও এখনও দেখা হয়নি। রাণা, খোকন একেবারে জুতো মোজা পড়ে রেডি।

সুজয়ের তখনও জলখাবার খাওয়াই শেষ হয়নি। সে বললে, আমার আজ বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা ঘুরে এসো; আমি এখানে থাকি।

তাই ঠিক হল, সবাই বেরিয়ে যেতে সুজয় আবার গিয়ে গুটিগুটি শুয়ে পড়ল বিছানায়। কেন যে তার এত ঘুম পাচ্ছে কে জানে!

দুপুরবেলা ওরা সবাই ফিরে এসে সুজয়কে আবার ডেকে তুলল। সুজয়ের। ঘুমকাতুরেপনা নিয়ে খুব হাসাহাসি করল রাণা আর খোকন। সুজয় তাড়াতাড়ি চলে গেল চান করতে।

ওরা দুপুরের খাওয়া সবে মাত্র শেষ করেছে, এসেই সময় বাইরে একটা জিপ গাড়ি থামল। আর দুজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে নামলেন কর্নেল চেতন সিং।

কর্নেল চেতন সিং-এর চেহারা দেখে সুজয় হাসবে কি কাঁদবে-ঠিক করতে পারল না। এক রাত্তিরেই কর্নেলের চেহারাটা কিরম বদলে গেছে। অত সুন্দর চেহারা ছিল কর্নেলের, এখন তার চোখ দুটো বেশ ট্যারা, চুলের রং-ও কীরকম খয়েরি হয়ে গেছে! কর্নেল বোধহয় সকাল থেকে আয়নায় নিজের মুখ দেখেন নি।

ঝর্ণা বলল, কর্নেলের চেহারাটা কীরকম বদলে গেছে মনে হচ্ছে।

সুজয় চুপ করে রইল। কাল সেই অদ্ভুত লোক দুটো কর্নেল সাহেবকে একবার অদৃশ্য করে দিয়েছিল। ফিরিয়ে আনার সময় হুবহু চেহারাটা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সেই কথা মনে পড়ায় সুজয়েরও বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। সুজয়কেও তো একবার অদৃশ্য করা হয়েছিল-তার কিছু বদলে যায়নি তো? না, বদলায়নি বোধহয়। তাহলে মা কিংবা ছোড়দি নিশ্চয়ই লক্ষ করতেন। তবু সুজয় এক ছুটে চলে গেল আয়নায় মুখ দেখতে।

কর্নেল সাহেবের মুখখানা খুব গম্ভীর। তিনি বাবাকে বললেন, মিঃ মুখার্জি, আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে।

কর্নেল আর দুজন অফিসার বাবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কি সব কথা বলতে লাগলেন।

একটু বাদেই বাবা দরজা ফাঁক করে ডাকলেন, জয়? জয় কোথায় গেল?

সুজয় জানতো যে তার ডাক পড়বেই। সে গুটি গুটি এগিয়ে গেল। ঝর্ণাও আসছিল সুজয়ের সঙ্গে। বাবা তাকে বললেন, তুই বাইরে থাক। ওঁরা জয়ের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চান।

সুজয় ভেতরে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

বাবা রীতিমত অবাক ভাবে বললেন, এ সব কী শুনছি? কাল রাত্তিরে তুই কোথায় গিয়েছিলি?

সুজয় এই ভয়টাই পাচ্ছিল। বাবার সামনে সে কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। অথচ কি করে সব কথা বলবে? সেই লোক দুজন যে এসব কথা বলতে বারণ করেছে!

কর্নেল নিজেই উত্তেজিতভাবে ইংরেজিতে বললেন, মিঃ মুখার্জি আপনি কিছুই জানেন না? কাল মাঝরাত্তিরে আপনার ছেলে দুজন লোক নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। সেই লোক দুটো কে?

বাবা সুজয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কাল রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিলি?

সুজয় আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ। আমার দুজন বন্ধু আমাকে ডেকেছিল–

বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, তোর দুজন বন্ধু? এখানে তোর বন্ধু এল কি করে? মাঝরাত্তিরেই বা তারা ডাকবে কেন?

দুজন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে একজন খসখস করে কি লিখে যাচ্ছিলেন। আর একজন হাত তুলে বাবাকে থামিয়ে দিয়ে সুজয়কে খুব মিষ্টিভাবে জিগ্যেস করলেন, সেই লোক দুজন কে?

সুজয় বলল, এমনিই দুজন লোক–

তারা কোথায় থাকে?

–তা তো জানি না।

কর্নেলসাহেব টেবিলে থাপ্পড় মেরে চেঁচিয়ে বললেন, জানতেই হবে। সেই লোক দুটোকে খুঁজে বের করতেই হবে। তারা কে? প্রীতমকুমারীর সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে তাদের কি করে দেখা হল?

সুজয় বলল, হঠাৎ দেখা হয়েছিল।

কর্নেল বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে চলল। তাদের আজই খুঁজে বার করা চাই। পুলিশকে বলা আছে।

সুজয় মাথা নেড়ে বলল, আপনারা তাদের খুঁজে পাবেন না। তা ছাড়া এক্ষুনি খুব জোরে বৃষ্টি নামবে।

সবাই দারুণ অবাক হয়ে সুজয়ের দিকে তাকাল।

.

সুজয় বুঝতে পারল, বৃষ্টির কথাটা তার বলে ফেলা ঠিক হয়নি। বাইরে খটখট করছে রোদ, ঝকঝক করছে নীল আকাশ। কোথাও একছিটে মেঘও নেই। শীতকালে এসব জায়গায় কোনওদিন বৃষ্টি হয় না।

সুজয়ের বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, একটু বাদে বৃষ্টি হবে? তার মানে কি? তুই কি করে জানলি?

সুজয় কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, সকালবেলা আমি একটু মেঘ দেখেছিলাম।

–সকালবেলায় মেঘ দেখেই বলা যায় বিকেলে বৃষ্টি হবে?

সুজয় আর বাহাদুরির লোভ সামলাতে পারল না। সে বলল, আমি বলছি, দেখো ঠিক বৃষ্টি হবে। এখন ক'টা বাজে। ঠিক সাড়ে চারটে বাজলেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।

বাবা তার ছেলের দিকে গোল গোল চোখ করে তাকালেন। ঘরের সবাই প্রায় এক মিনিট চুপ করে চেয়ে রইল। তারপর বাবা বললেন, তুই এসব কি বলছিস? তুই কি করে জানলি?

কর্নেলসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার কি মনে হচ্ছে না–আপনার ছেলে বেশ অদ্ভুত ব্যবহার করছে? ওর নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। রাত্তিরবেলা আপনাদের কিছু না বলে ও বেরিয়ে গিয়েছিল, দুজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে ও ঘুরেছে। এসব কি ব্যাপার?

অন্য যে মিলিটারি অফিসারটি সব কথা লিখে নিচ্ছিলেন, তিনি বললেন, সময় নষ্ট করে লাভ কি? চলুন, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া দরকার। তোক দুটিকে তো খুঁজে বার করা দরকার। তিনি বাবার দিকে ফিরে বললেন, আপনার ছেলেকে যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই আপনার কোনও আপত্তি আছে?

বাবা ভাবছিলেন, এরা চলে গেলে তিনি সুজয়কে নিয়ে জেরা করতে বসবেন। তাঁর ছেলে তো এরকম অদ্ভুত কাজ কখনও করেনি। সবাই তার ছেলের প্রশংসা করে।

তিনি কোনও উত্তর দেবার আগেই সুজয় বলল, আমি তো জানি না সেই দুজন লোক কোথায় থাকে?

–ওদের সঙ্গে কি করে তোমার বন্ধুত্ব হল?

–মানে, এমনি হঠাৎ দেখা হয়েছিল, মানে, ওরা আমার ঠিক বন্ধু না।

–ওদের নাম কি?

–জানি না তো?

–নাম জানো না, কোথায় থাকে তাও জানো না, অথচ তুমি রাতদুপুরে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?

সেই মিলিটারি অফিসারটি সুজয়ের পিঠে হাত দিয়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা তাদের ঠিকই খুঁজে বার করব। এ আমাদের সঙ্গে চলুক। এ ছাড়া তো আমরা কেউ সেই দু-জনকে চিনতে পারব না। কর্নেলসাহেবও তো মাত্র একটুখানি দেখেছেন।

সুজয় বাবার পাশ ঘেঁষে সরে এসে বলল, আমি যাব না।

–যাবে না কেন? তুমি ভয় পাচ্ছ?

–ওদের দুজনকে খুঁজে পাওয় যাবে না।

কর্নেলসাহেব দারুণ রেগে উঠলেন। চোখ দুটো আরও বেশি ট্যারা করে বললেন, পাওয়া যাবে না মানে? সমস্ত ইন্ডিয়া তন্নতন্ন করে খুঁজতে হলেও আমি তাদের ঠিক খুঁজে বার করব। ওরা আমার কাছে ম্যাজিকের খেলা দেখাতে এসেছে!

বাবা বললেন, কর্নেলসাহেব, আপনার চেহারাটা অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?

কর্নেলসাহেবের রাগ দপ করে নিভে গেল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখখানা। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে কি সত্যি? তাহলে কি সত্যি? আমার চেহারা সত্যিই বদলে গেছে?

অন্য দুজন মিলিটারির লোক মুখ টিপে একটু হাসলেন। বাবা বললেন, একটু যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে!

কর্নেলসাহেব ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আমি আয়নায় দেখে ভাবলাম–আমার চোখের ভুল। কিংবা আয়নাটা খারাপ হয়ে গেছে। সত্যি কি এরকম হতে পারে? আমার চোখ রাণা প্রতাপের মতন সুন্দর ছিল। সেই চোখ–

বাবা বললেন, আপনার চুলের রংও তো–

কর্নেল কান্না কান্না গলায় বললেন, আমার চুল ছিল কুচকুচে কালো। সবাই দেখেছে–

কর্নেল আবার উঠে এসে সুজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, তোমার বন্ধুরা আমায় এরকম করেছে?

সুজয় বলল, জানি না তো?

–চলো; এক্ষুনি চলো। তাদের ধরে আমি গুলি করে মারব।

ওই লোক দুটিকে সুজয়ের খারাপ লাগেনি একটুও। প্রীতমকুমারীকে বাঁচাবার কত চেষ্টা করেছিল। সুজয়ের সঙ্গে সব সময় কি সুন্দরভাবে কথা বলেছে। যদিও সুজয় জানে, ওদের ধরার সাধ্য কারুর নেই। ওরা তো ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে–সুজয় নিজের চোখে দেখেছে। তবু মিলিটারির লোক যদি আচমকা ওদের দুজনকেই পেছন থেকে ধরে চোখ বেঁধে দেয়? তখন ওরা ভাববে, সুজয়ই ওদের ধরিয়ে দিতে নিয়ে এসেছে।

সুজয় বলল, আমি যাব না।

কর্নেল সাহেব তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, তোমাকে যেতেই হবে।

বাবা বললেন, তুই যেতে চাইছিস না কেন? চল আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

সুজয় কিছুতেই যেতে চায় না। ওঁরা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সুজয়। ঘরের কোণে সরে দাঁড়িয়ে শুধু বলতে লাগল, আমি যাব না, আমি যাব না।

বাবা তখন বললেন, সেই লোক দুটোকে তুই ছাড়া আর কেউ দেখেনি? রাণা কিংবা খোকন?

সুজয় বলল, ছোড়দি দেখেছে!

বাবা তক্ষুণি দরজা খুলে ডাকলেন, ঝর্ণা, ঝর্ণা!

ঝর্ণা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে ঘরে আসতেই কর্নেল সাহেব বললেন, মিস মুখার্জি, আপনার ছোট ভাইয়ের দুজন বন্ধু–একজন লম্বা আর একজন বেঁটে–আপনি তাদের দেখেছেন?

ঝর্ণা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কারা রে? সেই যে–

সুজয় বলল, হ্যাঁ, সেই যে, অজন্তা পাহাড়ে দেখেছিলে না?

ঝর্ণা বলল, ও, সেই লোক দুটো? কেন, কি করেছে তারা?

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, আপনি তাদের দেখলে আবার চিনতে পারবেন?

ঝর্ণা একটু অহংকারের সঙ্গে বলল, একবার কারুর সঙ্গে আলাপ হলে আমি তাদের কক্ষণ ভুলি না।

–তা হলে আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনার বাবাও যাচ্ছেন।

–আপনার চোখে কি হয়েছে?

কর্নেলসাহেব হাত দিয়ে নিজের মুখটা চাপা দিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, সে পরে শুনবেন। বেরিয়ে পড়া যাক। আপনার কি তৈরি হতে সময় লাগবে?

ঝর্ণা বলল, না, আমি তো তৈরিই আছি। আমি এক্ষুনি বেরুতে পারি।

–চলুন তাহলে।

সুজয় বলল, ছোড়দি যেও না। একটু বাদেই দারুণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি!

কর্ণেল সাহেব এবার সুজয়কে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, শাট আপ! তুমি আমাদের অনেক বিরক্ত করেছ। অনেক বাজে কথা বলেছ। এখন চুপ করে বসে থাকো।

সুজয় আর কিছু বলল না। ওরা সবাই মিলে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই সত্যি সত্যিই সোঁ-সোঁ করে ঝড় উঠল। কোথা থেকে কালোকালো মেঘ এসে ছেয়ে ফেলল আকাশ। চারিদিক অন্ধকার করে বইতে লাগল ধুলোর ঝড়। সেইসঙ্গে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি।

মা জানলা বন্ধ করতে এসে দেখলেন, সুজয় জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃষ্টির দাপটে মনে হচ্ছে আকাশ ভেঙে পড়ছে। দারুণ হাওয়ায় চারিদিক ধোঁয়া ধোয়া হয়ে গেছে। এখানে সেখানে দরজা-জানলায় আওয়াজ হচ্ছে ঠকাস-ঠকাস করে। কোথায় যেন একটা টিনের চাল উড়ে গেল। মনে হচ্ছে, গাছপালা ভেঙে পড়বে, ঘরবাড়ি সব ভেসে যাবে।

মা এসে সুজয়কে বললেন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সরে আয়, জানলা বন্ধ করে দিই।

সুজয় বলল, বাবা আর ছোড়দি এই বৃষ্টির মধ্যে বেরুল! কি হবে বল তো?

মা বললেন, এ বৃষ্টি আর কতক্ষণ হবে। অসময়ের বৃষ্টি, একটু বাদেই থেমে যাবে।

সুজয় বলল, না মা। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না। আমি কত করে বললাম, এক্ষুণি খুব বৃষ্টি হবে, বেরিও না!

–তুই কি করে জানলি যে বৃষ্টি হবে?

–আমি জানতাম। তোমরা তো আমার কথা বিশ্বাস করো না!

মা সুজয়ের কথা শুনে কি বুঝলেন কে জানে। তিনি একদৃষ্টে তাকিয় রইলেন ছেলের দিকে। তারপর ওর মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, তোর বাবা তোর ওপর খুব রেগে গেছেন। তুই নাকি কাল রাত্তিরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলি?

সুজয় বলল হ্যাঁ।

–এ কি সাংঘাতিক কথা! তোকে কেউ ডেকেছিল? কক্ষনো রাত্তিরে কেউ ডাকলে বেরুতে নেই। নিশি ডাকলে কি হয় জানিস?

সুজয়ের সারা শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। কাল রাত্তিরে সে একবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর যদি ওরা তাকে আবার ফিরিয়ে না আনত? তাহলে মা-বাবা এতক্ষণ কি করতেন? মা সুজয়ের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন। সব মায়ের গায়েই একটা মা মা গন্ধ আছে। তাতে মনটা কি রকম নরম হয়ে যায়। যে কথা সুজয় কাউকে বলেনি, এখন সেটা মাকে বলে ফেলল।

মাকে জড়িয়ে ধরে সুজয় বলল, মা তোমাকে একটা কথা বলব? তুমি আর কাউকে বলবে না বলো?

মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, কি রে?

–আমার সঙ্গে না দুজন দেবতার দেখা হয়েছিল!

–সে কি রে?

–হ্যাঁ মা সত্যি। ওঁদের ছায়া পড়ে না, গা দিয়ে রক্ত পড়ে না। ওঁরা মানুষকে অদৃশ্য করে দিতে পারে।

মায়ের মুখটা শুকিয়ে গেল। মায়েদের মন সব সময় বিপদের আশঙ্কা করে। সুজয় কোনও দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েনি তো? আজকাল তো পথেঘাটে চোর জোচ্চার গিসগিস করছে।

মা বললেন, কি করে তাদের সঙ্গে দেখা হল? তারা কারা?

–তারা দেবতা। তারা এই পৃথিবীর কেউ না, আকাশ থেকে এসেছে। আচ্ছা মা, দেবতারা কি কাঁদে? আমি ওদের কাঁদতে দেখেছি।

মা বললেন, এসব কি বলছিস তুই? দেবতাদের কি এমনি এমনি দেখা পাওয়া যায়?

–কেন পাওয়া যাবে না? তুমি সেই যে একটা গল্প বলতে, একটা ছেলে রোজ দীনবন্ধু দাদাকে ডাকত। তারপর একদিন দীনবন্ধু দাদা সত্যিই এসে দেখা দিলেন।

মা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। কী যে বলবেন, বঝুতে পারলেন না। তিনি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু ঠাকুর-দেবতার দেখা পাওয়াটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বললেন, সে তো আগেকার দিনে দেখা পাওয়া যেত। এখন পৃথিবী পাপে ভর্তি হয়ে গেছে, এখন কি আর দেবতারা আসেন!

সুজয় জোর দিয়ে বলল, না মা, তুমি জানো না। দেবতারা এখনো এসে আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। লোকে তাদের চিনতে পারে না।

–তা হলে তুই চিনলি কি করে?

–আমার চোখ যে অন্য রকম। তোমরা তো বিশ্বাস করো না। দেবতারাও বলেছেন, আমার চোখ অন্য রকম। আমি যে ওঁদের অলৌকিক রূপ দেখতে পেলাম।

মা তবুও খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, সেই দেবতারা তোকে বলে দিয়েছেন যে আজ বৃষ্টি হবে?

–হ্যাঁ, ওঁরাই তো বলেছেন। তুমি জানো না মা, যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়, সেদিন দেবতারাই সেটা ইচ্ছে করে তৈরি করেন। এখন বুঝতে পারলে তো, খবরের কাগজে আবহাওয়ার খবর কেন মেলে না? যেদিন লেখে খুব বৃষ্টি হবে, সেদিন খটখটে রোদ থাকে। তারা তো দেবতাদের খবর রাখে না। দেবতাদের যখন রকেট নামে–সেই সময় ঝড়বৃষ্টি হয়।

মা বললেন, তোর চোখমুখ বড্ড শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে?

–না তো।

মা সুজয়ের কপালে হাত ছুঁইয়ে বললেন, গা-টা গরম-গরম লাগছে। জ্বর আসছে নাকি! এই ঠান্ডার মধ্যে জানলার পাশে দাঁড়াসনি, সরে আয়। সুজয় বলল, মা, আমি একটা জিনিস দেখবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

–এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কি দেখবি?

–দেখতে চেষ্টা করছি, ছোড়দি আর বাবা এখন কি করছে। ওদের কিছু হল কিনা।

–ওরা তো অনেক দূরে চলে গেছে, তুই দেখবি কি করে?

–আমি এক এক সময় দেখতে পাই।

বলতে-বলতেই সুজয় মাকে জড়িয়ে ধরল। খুব ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে বলল, মা, মা, সাজ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছে। বাবাদের গাড়ি উলটে গেছে। শিগগিরই যেতে হবে। আমাকে।

মায়ের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সুজয় এসব কি বলছে? এতদিন পরে তিনি নিজের ছেলের কথাও বুঝতে পারছেন না!

সুজয়কে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুই বলছিস কি? তুই দেখতে পাচ্ছিস?

সুজয় বলল, হ্যাঁ মা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাবাদের গাড়ি উলটে গেছে। ওদের খুব বিপদ। আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে।

মা প্রায় কেঁদেই ফেললেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, কি সর্বনাশের ব্যাপার! কি হবে তা হলে?

ততক্ষণে চেঁচামেচি শুনে রাণা আর খোকন এসে গেছে। সুজয় ওদের বললে, বাবাদের গাড়ি উল্টে গেছে। আমাদের সাহায্য করতে যেতে হবে।

খোকন তক্ষুনি রাজি। সে বলল, রাণা এখানে থাক। তুই আর আমি যাই।

রাণা থাকতে রাজি নয়। সে বলল, আমিও যাব!

মা তাড়াতাড়ি ওদের বাধা দিয়ে বললেন দাঁড়া-দাঁড়া! তোরা কোথায় যাবি এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে?

সুজয় বলল, ঝড়বৃষ্টিতে আমাদের কিছু হবে না!

সুজয়ের বাবা এবং ঝর্ণার বিপদের কথা শুনে মা খুব ভয় পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু এইরকম সময়ে ছেলেদেরই বা বাইরে পাঠাবেন কি করে? মা একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

খোবন বলল, আগে এক কাজ করলে হয় না? হোটেল থেকে থানায় একটা ফোন করব? অ্যাকসিডেন্ট হলে ওরা নিশ্চয়ই জানবে।

মা বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই তো ভালো। চল তো!

সবাই দৌড়োলো ম্যানেজারের ঘরের দিকে।

হোটেলে একটিই মাত্র টেলিফোন, সেটা থাকে ম্যানেজারের ঘরে। তিনি আবার সেটাকে তালাবন্ধ করে রাখেন। ওরা এসে দেখল টেলিফোন তালা বন্ধ। তিনি ঘরে নেই।

সুজয় আর খোকন চেঁচামেচি করে ডাকতে লাগল ম্যানেজারকে। একজন বেয়ারা এসে বলল, ম্যানেজারবাবু ঘুমোচ্ছন। মা তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, কেন ঘুমোচ্ছেন? এটা কি ঘুমোবার সময়? শিগগির ডেকে নিয়ে এসো তাকে।

ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, কি হয়েছে? কি ব্যাপার?

মা তাকে বললেন, এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আর আপনি এখন ঘুমোচ্ছেন?

–কি কান্ড হয়েছে?

–এ রকম ঝষ্টি!

–ঝড়বৃষ্টি কি টেলিফোন করে থামাবেন?

–আঃ, সে কথা হচ্ছে না। একটা দারুণ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

–কোথায়? আপনারা কি করে জানলেন?

খোকন বলল, আমরা পয়সা দিয়ে টেলিফোন করব, আপনি শুধু-শুধু দেরি করিয়ে দিচ্ছেন কেন?

থানায় টেলিফোন করতেই তারা বলল, আমরা এইমাত্র মিলিটারি থেকে ওয়ারলেসে খবর পেলাম, একটা গাড়ি উলটে গেছে। তাতে দুজন কর্নেল আর একজন অফিসার ছিলেন।

মা জিগ্যেস করলেন, তাতে মিঃ মুখার্জি বলে এক ভদ্রলোক আর একটি মেয়ে ছিল না?

–তা ঠিক বলতে পারছি না।

–অ্যাকসিডেন্টটা কোথায় হয়েছে? কোন জায়গায়?

সুজয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে আপনমনে বলল, সেই জায়গাটায় রাস্তার পাশে একটা খাদ আছে। তার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী যাচ্ছে। একটা মস্ত বড় গাছ কাত হয়ে আছে।

খোকন জিগ্যেস করল, তুই কি করে জানলি রে! সুজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমি জানি।

মা টেলিফোনে আবার বললেন, আমরা এক্ষুনি সেখানে যেতে চাই! কর্নেলরা আমাদের এখানেই এসেছিলেন। আমার স্বামী আর মেয়েকে নিয়ে গেছেন। আপনারা গাড়ি পাঠান।

–আপনারা এখন কি করে যাবেন! অপেক্ষা করুন; আমরা একটু বাদে আবার। খবর পাঠাব।

মা টেলিফোনটা রেখে দিয়ে ম্যানেজারকে বললেন, আপনি খবরদার টেলিফোনে এখন তালা লাগাবেন না। ঘুমোতেও যেতে পারবেন না। আমরা এখন এখানেই বসে থাকব।

খোকন বলল, যাব না আমরা? সুজয় তো জায়গাটা চেনে?

মা বললেন, না, এখানে থাকো সবাই। এক্ষুনি আবার খবর আসবে।

সুজয় আবার মনে মনে ভাবতে লাগল, সেই লোক দুজন, তারা দেবতা হোক বা না হোক, তারা ভালো লোক। তারা তো কারুর ক্ষতি করতে চায় না। বাবা, ছোড়দি, কর্নেলরা বিপদে পড়লেন, ওরা কি সাহায্য করবে না?

ওরা এই বৃষ্টি তৈরি করেছে, বৃষ্টির জন্যই তো এরকম বিপদ হল। এখন বৃষ্টি থামিয়ে দেওয়া উচিত।

সুজয় আবার জানলার কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, সেই লোক দু'জন এখন কোথায় আছে। এখন একবার তাদের দেখা পাওয়া গেলে খুব ভালো হতো।

ওরা বলেছিল, মানুষের মনের শক্তি অসাধারণ। মনে-মনে খুব করে ওদের কথা ভাবলে কি ওদের দেখা পাওয়া যাবে না?

সুজয় অনেক করে ভাবল ওদের কথা। মনে-মনে খুব ডাকতে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কাল রাত্রে সুজয় কত দূরে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ওদের দেখতে পেয়েছিল। তখন সুজয়ের মনে পড়ল, এই সময়ে ওদের দেখতে পাওয়া যাবে না বলেই তো ওরা ঝড়বৃষ্টি তৈরি করেছে। তাই তো!

বৃষ্টি কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। একটু বাদেই ঝড়-বৃষ্টি একসঙ্গে থেমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

মা আবার থানায় টেলিফোন করলেন। থানা থেকে বলল, এখনো নতুন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের দুটো গাড়ি গেছে ওদিকে।

সুজয় খোকনের হাত ধরে টেনে বলল, চল তো! মা, তুমি থাকো, আমরা চলোম।

মা আর বাধা দেবার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই সুজয় আর খোক বাঁই বাঁই করে বেরিয়ে গেল। রাণা একটুখানি এদিক-ওদিক করে বলল, দেখে আসি তো ওরা কোথায় গেল!

রাণাও বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ওরা দুজনে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। রাণা খুব জোরে ছুটে ওদের ধরে ফেলল।

সুজয় ছুটছে তো ছুটছেই। খোকন একসময় বলল, আর কত দূর?

সুজয় বলল, তা জানি না।

কুকুর যেমন গন্ধ শুঁকে-শুঁকে একদিকে দৌড়োয়, সুজয়ও অনেকটা সেইভাবে দৌড়োচ্ছে।

তারপর এক সময় দেখা গেল, এক জায়গায় কয়েকখানা গাড়ি আর কিছু পুলিশের ভিড়। সেখানে ঠিক রাস্তার পাশে একটা খাদ, তার পাশে নদী, হেলেপড়া গাছ-সেই

গাছের সঙ্গে আটকে আছে কর্নেল সাহেবের গাড়ি।

সুজয়রা যখন এসে পৌঁছল, তখন ওই গাড়ির সকলকে একটা অ্যামবুলেন্স-এ তোলা হয়েছে। আর একটা গাড়িও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সুজয়রা সেই গাড়িটাতে উঠে বসল। বাবা ও ছোড়দিকে দেখতে পেল না।

খুব জোরে গাড়ি দুটো এসে থামল হাসপাতালের সামনে। এই সেই হাসপাতাল, যেখানে কালকে রাত্তিরেই প্রীতমকুমারী মারা গেছে। সুজয়ের বুক ছম ছম করতে লাগল।

.

কর্নেলসাহেব, তার সঙ্গে অন্য দুজন মিলিটারি অফিসার, সুজয়ের বাবা এবং ঝর্ণা পাশাপাশি শুয়ে আছে হাসপাতালের খাটে। দুজনেই অজ্ঞান। কারুর গায়ে কোনও আঘাত লাগেনি, কোনও জায়গা থেকে রক্ত বেরোয়নি, কিন্তু জ্ঞান ফিরছে না।

প্রীতমকুমারীকে দেখবার জন্য যেসব ডাক্তার এসেছিলেন, তাদের কয়েকজন এখনও রয়ে গেছেন। তারাই ছুটে এলেন আবার। ঝড়বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার।

সুজয়, খোকন আর রাণাকে একবার মাত্র ঘরে ঢুকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাদের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে। সুজয়ের মাকে খবর পাঠানো হয়েছে, তিনি একটু বাদেই এসে পড়বেন এখানে।

সুজয় হাসপাতালের বারান্দায় এসে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। সেই লোক দু'টি বলেছিল, ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই তাদের রকেট উড়ে যাবে। এতক্ষড়ে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে। তবু সুজয় চেষ্টা করছে, যদি একটুও দেখা যায়। ওরা কি আর ফিরে

আসবে না?

খোকন জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে জয়, তুই কী করে তখন বললি যে, পিসেমশাইদের গাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

সুজয় গম্ভীরভাবে বলল, আমি দূর থেকে অনেক জিনিস দেখতে পাই।

–তুই কি জ্যোতিষী হয়েছিস নাকি?

–জ্যোতিষীদের থেকেও আমি বেশি দেখতে পাই।

–আচ্ছা, তুই কত দূর অবধি দেখতে পাস? তুই বলতে পারিস, জলগাঁওতে বাবা আর মা এখন কি করছে?

–হ্যাঁ পারি।

–বল তো!

সুজয় হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে চোখ বুজল। ম্যাজিসিয়ানদের মতন ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর চোখ খুলেই বলল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোদর বাড়ির আলমারির চাবি হারিয়ে গেছে, মামাবাবু আর মামিমা সেটা খুঁজছেন। পাবেন কিন্তু। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, চাবিটা পড়ে আছে বাথরুমের এক কোণে।

রাণা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, সত্যি?

সুজয় বলল, কেন ক'টা বাজে দেখে রাখ। জলগাঁওতে গিয়ে মিলিয়ে দেখিস।

খোকন বলল, জয়টা যা গুল ঝাড়তে শিখেছে না!

সুজয় বলল, বললুম তো মিলিয়ে দেখিস। এখন ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজে।

সুজয় এমন ভাবে বলল যে ওরা আর মুখের ওপর অবিশ্বাস করতে পারলো না। সুজয় অবশ্য এই কথাটা বানিয়েই বলেছে। জলগাঁও-এর দৃশ্য ও কিছুটা দেখতে পায়নি। সব সময় তো সে দূরের জিনিস দেখতে পায় না। এক-এক সময় হঠাৎ হঠাৎ শুধু মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটে ওঠে। এখন সে অনেক চেষ্টা করেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ হাসপাতালের মধ্যে অনেক লোকের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। ওরা দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখল, পাঁচজনেরই একসঙ্গে জ্ঞান ফিরে এসেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, পাঁচজন ঠিক একসঙ্গে চোখ খুলে তাকিয়ে বলে উঠেছে কি হয়েছে আমাদের?

কর্নেল চেতন সিং খাট থেকে তড়াক করে নেমে পড়লেন নিচে। চেঁচিয়ে বললেন, আমাদের তো কিছু হয়নি। আমাদের হাসপাতালে আনা হয়েছে কেন?

একজন ডাক্তার মৃদু গলায় জানালেন, আপনাদের গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

–সে তো সামান্য অ্যাকসিডেন্ট। তার জন্য হাসপাতালে আনবার দরকার কি?

ঝর্ণা চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে বলল, আমরা মরে যাইনি?

সুজয় এগিয়ে এসে বলল, কেন ছোড়দি? তোমাদের কি হয়েছিল?

ঝর্ণা বলল, আমি তো দেখলাম, আমাদের গাড়িটা ঝড়ে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেল রাস্তা থেকে। গাড়িটা হাওয়ায় ভাসছিল, তারপর যখন নিচে আছড়ে পড়তে লাগল, তখন আমি ভয়ে চোখ বুজলাম।

অন্য মিলিটারি অফিসারটি বললেন, আমিও তাই দেখেছিলাম। কিন্তু গাড়িটা ওপর থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেল, তবু আমাদের কারুর হাত-পা কিছুই ভাঙল না!

সুজয়ের বাবা বললেন, ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছি।

কর্নেল চেতন সিং বললেন, আমরা একটা জরুরি কাজে যাচ্ছিলাম। এরকমভাবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

কর্নেল সাহেবের চোখ দুটো এখন আরও বেশি ট্যারা হয়ে গেছে। সেইজন্যই মুখখানা খুব রাগী রাগী দেখাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, এখন আপনাদের কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। এখন আপনাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

কর্নেল বললেন, ননসেন্স। আমাদের সকলেরই শরীর ঠিক আছে। সেই রহস্যময় লোক দুটোকে খুঁজে বার করতেই হবে। দেরি করলে তারা পালিয়ে যেতে পারে।

কর্নেল তারপরই সুজয়ের দিকে ফিরে বললেন, এই যে শোনো, তুমি কি করে আগে থেকে বললে যে, একটু পরেই বৃষ্টি হবে? কোনও বছরই এই সময় ঝড়বৃষ্টি হয় না?

সুজয় উত্তর না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। সুজয়কে বাঁচিয়ে দিল সুজয়ের মা। তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। তারপর যখন দেখলেন যে, তাঁর স্বামী এবং মেয়ে দু-জনেই ভালো আছে, গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি, তখন তিনি হাসবেন না কাদবেন বুঝতে পারলেন না। এর আগেই তিনি কালীঘাটে পুজো দেবার জন্য মানত করে ফেলেছিলেন। সবাই তাকে ঘিরে ধরল।

সুজয়ের মা বললেন, তোমরা এক্ষুনি হোটেলে ফিরে চলো। হাসপাতাল দেখলেই আমার ভয় করে।

কর্নেল বললেন, কিন্তু আমাদের যে এক্ষুনি কাজে বেরুতে হবে।

মা এক ধমক দিয়ে বললেন, আপনার কাজ আপনি করুন গে। ওরা কোথাও যাবে না এখন। যত অলক্ষুণে ব্যাপার!

পুলিশের গাড়ি ওদের সবাইকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

মা বললেন, আর এখানে আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না বাপু। কাল ভোরবেলাতেই ফিরে চলো।

বাবা বললেন, সেই ভালো। আজ আর কারুর বেরিয়ে দরকার নেই।

মা জয়ের দিকে ফিরে বিশেষ করে বললেন, জয়, তুই একদম বেরুবি না কিন্তু। তা হলে কিন্তু মার খাবি আমার কাছে।

সুজয় বেরুল না বটে, কিন্তু অন্যদের সঙ্গেও থাকতে চাইল না। সে একা এসে দাঁড়াল বারান্দায়। একটু পরেই যেন দুটো পাখির ডানা ঝাঁপটানোর মতন শব্দ হল। তারপরই সুজয় দেখল, তার কাছেই সেই লোক দুটি এসে দাঁড়িয়েছে।

সুজয় অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই তারা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, আস্তে। জয়বাবু, আপনার বাবা আর দিদি ভালো আছেন তো?

সুজয় বলল, হ্যাঁ, খুব ভালো আছে। আপনারা চলে যাননি?

লম্বা লোকটা বলল, না, যাওযা হয়নি। আমাদের রকেটে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। রাত্তিরের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

বেঁটে লোকটা বলল, সেই ফাঁকে আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম। আমাদের কথা কাউকে বলেননি তো?

–না, কিন্তু আপনারা চলে যাচ্ছেন–আর আসবেন না?

–অন্য কেউ আসবে। আমাদের আবার আসতে অনেক দেরি হবে। অনেক দূরে যেতে হবে তো!

–কত দূরে?

লম্বা লোকটি বলল, সে একটা শক্ত অঙ্কের মতন ব্যাপার। আপনি কি বুঝতে পারবেন? এক আলো-বছর কাকে বলে জানেন? এক বছরে আলো যতই দূরে যায় তার মানে ১৮৬০০০□৬০□৬০□২৪□৩৬৫ মাইল। এরকম এক কোটি পনেরো লক্ষ আলো-বছর দূরে আমরা থাকি। এবার তাহলে হিসেব করুন!

এক বিরাট অঙ্ক শুনে সুজয়ের মাথা ঘুরে গেল। হিসেব করার কোনও চেষ্টাই করল না সে। তার আগেই সে চমকে উঠল। আবার তাদের হোটেলের দিকে দু-খানা মিলিটারি গাড়ি আসছে।

সুজয় বলল, সর্বনাশ, কর্নেলসাহেব আসছেন!

লম্বা লোকটি বলল, কর্নেলসাহেব আসছেন, তাতে সর্বনাশ হবে কেন?

সুজয় বলল, কর্নেলসাহেব আপনাদের দারুণভাবে খুঁজছেন। উনি আপনাদের ওপর খুব রেগে গেছেন।

–কেন?

–বাঃ, কর্নেলসাহেবের চোখ ট্যারা করে দিয়েছেন যে আপনারা!

বেঁটে লোকটি এই কথা শুনে খুব হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে বলল, তাই নাকি? চোখ ট্যারা হয়ে গেছে? কীরকম দেখাচ্ছে এখন?

–খুব বিচ্ছিরি!

–ইস, তাহলে তো খুব দুঃখের কথা! আমি আবার ঠিক করে দিতে পারি।

লম্বা লোকটি হাত তুলে বলল, না, তার সময় নেই। আমাদের আজ রাত্তিরেই চলে যেতে হবে।

–এখনও তো রাত্তিরের অনেক দেরি। দিন না ঠিক করে!

–তার উপায় নেই যে জয়বাবু! এখন কিছু করতে হলে সবাইকে জানিয়ে করতে হবে। সেটা ঠিক নয়। আপনি জেনে ফেলেছেন বটে, কিন্তু অন্য সকলকে আমাদের কথা এখন জানানো ঠিক নয়।

–কেন, কি হবে জানলে?

–পৃথিবীতে অনেক গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু সেগুলো শিখতে হবে আস্তে আস্তে। আগের অনেক কিছু না জেনে পরের একটা কিছু হঠাৎ জেনে ফেললে, মাথার গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আমরা যেমন চোখের নিমেষে যে-কোনও জিনিসকে বদলে দিতে পারি–সেটা এখনও-এখানে সকলকে জানাবার সময় আসেনি। এখন এটা জানলে লোকেরা এই নিয়ে ছেলেখেলা করবে। যেমন, অণু-পরমাণু ভাঙতে শিখে হঠাৎ বোমা বানিয়ে ছেলেখেলা করছে।

–আপনাদের অ্যাটম বোমা আছে?

লম্বা লোকটি হেসে বলল, না।

সুজয় অবাক হয়ে বলল, আপনাদের রকেট আছে, আর অ্যাটম বোমাই নেই?

–শুধু অ্যাটম বোমা কেন, আমাদের কোনও অস্ত্রই নেই। আট হাজার বছর আগে শেষ বোমা ফেটেছিল। এখন ছেলেরা বাজি ফাটায় শুধু।

–আপনাদের বন্দুক-পিস্তলও নেই?

–যাদুঘরে আছে।

কর্নেলসাহেবের গাড়ি একটু আগেই থেমেছিল। কর্নেলসাহেব হোটেলের দরজা দিয়ে ঢুকেও আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ওপরে বারান্দার দিকে তাকালেন, সুজয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল। তিনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

সুজয় বলল, এই রে, কর্নেলসাহেব আপনাদের দেখে ফেললেন কিন্তু।

বেঁটে লোকটি বলল, এখন আর দেখতে পাচ্ছেন না।

–হ্যাঁ, পাচ্ছেন। এদিকেই তো তাকিয়ে আছেন!

–তাও পাচ্ছেন না।

সুজয়ের এটা কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। সে নিজের চোখে লোক দুজনকে দেখতে পাচ্ছে, কর্নেলসাহেবকেও দেখতে পাচ্ছে। তাহলে কর্নেলসাহেব ওদের দেখতে পাবেন না কেন?

কর্নেলসাহেবও যেন কীরকম করছেন। একবার দুহাত দিয়ে চোখ রগড়ালেন। মাথা ঝুঁকিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। খুব যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। তারপর হনহন করে আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সুজয় বলল, উনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছেই আসছেন। যদি সোজা এখানে চলে আসেন।

এই কথাটা বলেই সুজয়ের মনে হল, এরকমভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি আবার বলল, আসুক না, আপনাদের তো ভয় নেই। আপনাদের তো কেউ কিছু করতে পারবে না।

লম্বা লোকটি বলল, একজন আরেকজনকে দেখে ভয় পাবে কেন? ভয় জিনিসটা ভালো নয়।

এই সময় হঠাৎ আকাশে একবার মাত্র বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সুজয় বলল, একি, আবার বৃষ্টি হবে নাকি?

বেঁটে লোকটি বলল, না। এবার আমাদের চলে যেতে হবে। ওটা সেই চিহ্ন।

লম্বা লোকটি বলল, জয় বাবু, আমরা তাহলে চলোম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম একটা কথা বলার জন্য। দুপুরে ঝড়বৃষ্টির সময় আমরা এখানকার আকাশ নিয়ে একটা পরীক্ষা করছিলাম। সে সময় আমরা চেয়েছিলাম, কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। আপনার বাবা আর দিদি তখন গাড়িতে যাচ্ছিলেন

তাই গাড়িটা থামিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু আমরা সাবধানে করেছি সেটা, যাতে কারুর গায়ে কোনও আঘাত না লাগে।

সুজয় বলল, কারুর লাগেনি। কিন্তু একটা কথা শুনুন। আপনারা আর ফিরে আসবেন না?

–সেটা ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না।

সুজয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। যে-কোনও কারণেই হোক, এই লোক দুটিকে ভালো লেগে গিয়েছিল তার। দেবতাদের তো কখনও দেখেনি সে। মনে হয়, এরা দেবতাদের থেকেও ভাল।

এই কথাটা মুখেই বলে ফেলল সে। বলল, আপনারা চলে গেলে আপনাদের জন্য আমার মন কেমন করবে!

লম্বা লোকটি বলল, সত্যি? জয়বাবু, আপনি খুব ভালো।

বেঁটে লোকটি বলল, জয়বাবু, আপনার জন্য আমাদেরও মন কেমন করবে। কারুর সঙ্গে একবার ভাব হয়ে গেলে তাকে ছেড়ে যেতে আমাদেরও কষ্ট হয়।

বেঁটে লোকটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুজয়ের দিকে। মন হল ওর চোখে জল এসে যাচ্ছে। হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছল। সুজয়ের মনে পড়ল, দেবতারা কাঁদে কিনা–এই কথাটা এখনও জানা হয়নি।

বেঁটে লোকটি বলল, জয়বাবু, আমাদের গ্রহ থেকে কেউ-কেউ এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আসি। প্রত্যেকবারই ভাবি, আগের বারের চেয়ে সবকিছুই ভালো দেখব। কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখি, মানুষ আরও বেশি রাগী হয়ে যাচ্ছে। এখনও তারা ঝগড়া মারামারি করে। দেখে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। জয়বাবু, আপনি বড় হয়ে চেষ্টা করবেন যাতে সব মানুষ ভালো হয়ে ওঠে। চেষ্টা করবেন তো?

জয় কিছু বলার আগেই তার ছোড়দি ঘরের মধ্যে থেকে বলল, এই জয়, ওখানে কে কথা বলছে রে?

তারপরই ঝর্ণা বারান্দায় উঁকি মেরে বলল, একি, এই তো সেই দুজন লোক!

লম্বা ও বেঁটে লোক দুটি ঝর্ণাকে দেখে খুব বিনীতভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বললে, নমস্কার। ভালো আছেন তো?

ঝর্ণা বলল, আপনারা এখানে কি করে এলেন?

লম্বা লোকটি বলল, আপনাদের পাশের ঘরের একজনের সঙ্গে আমাদের চেনা আছে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আচ্ছা চলি–

আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ওরা দুজন বারান্দা দিয়ে হেঁটে হোটেলের অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

এই সময় সুজয়ের বাবা ডাকলেন ঝর্ণাকে। কর্নেলসাহেব সেখানে বসে আছেন। তিনি বললেন, আমার মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, না চোখ খারাপ হয়ে গেছে? আমি একবার

দেখলাম, আপনার ছেলের পাশে সেই অদ্ভুত লোক দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পরের মুহূর্তেই দেখলাম নেই।

ঝর্ণা বলল, ভুল দেখবেন কেন? ওরা তো সত্যিই এসেছে। কর্নেলসাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন কোথায়?

–আমাদের পাশের ঘরে।

–শিগগিরি চলুন।

সবাই ছুটে গেল সেই ঘরটার দিকে। আগে খেয়াল হয়নি, এখন দেখা গেল, সেটা দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ। সেখানে কোনও লোক নেই। তখন বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকা হল। সেখানেও কেউ নেই।

কর্নেলসাহেব তখন সুজয়ের দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন, লোক দুটো তোমার কাছে এসেছিল কেন?

সুজয় বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

–ওরা কারা? তোমাকে বলতেই হবে।

–ওরা খারাপ লোক নয়। ওরা ভালো–

কর্নেল বললেন, এত তাড়াতাড়ি লোক দুটো বেশি দূর যেতে পারবে না। ওদের ধরতেই হবে।

ঝর্ণা বলল, আমি তো এই এক মিনিট আগেই দেখলাম। এতক্ষণে বড়জোর গেটটুকু পেরিয়েছে।

সবাই হুড়োহুড়ি করে নেমে এল নিচে। গেটে দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, একজন লম্বা আর একজন বেঁটে লোককে সে একটু আগেই বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

কর্নেল তড়াক করে গাড়িতে চেপে বললেন, আপনারা আসতে চানত আসুন।

সকলেই উঠে বসল গাড়িতে। ড্রাইভারের পাশে কর্নেল আর বাবা। ঝর্ণা আর সুজয় পেছনে। সুজয় ফিসফিস করে ঝর্ণাকে বলল, ছোড়দি, ওদের কেউ ধরতে পারবে না। আমি তোমাকে বলছি, বিশ্বাস করো। ওরা খুব ভালো–

ঝর্ণা বলল, ওই তো ওরা যাচ্ছে–

সোজা রাস্তায় খানিকটা দূরে সত্যি দেখা গেল লোক দুটিকে, যেন খুব নিশ্চিন্তে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। সুজয় বুঝতে পারল, ওরা নিশ্চয়ই মজা করছে। না হলে ওরা তো ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

লোক দুটো পিছন ফিরে গাড়িটাকে দেখে দৌড়াতে শুরু করল। কর্নেলসাহেব চেঁচিয়ে বললেন, জোরসে চালাও। ওদের ধরতেই হবে।

কিন্তু লোক দুটো এমন জোরে দৌড়াচ্ছে যে গাড়ি ফুল স্পিডে চালিয়েও ওদের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারছে না। ঠিক সমান দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। কর্নেলসাহেব চেঁচাতে লাগলেন, জোরে, আরও জোরে

বেশ কিছুক্ষণ এইরকম চলল। সুজয় জানে যে, ওদের কিছুতেই ধরা যাবে না, তবুও সে উত্তেজনা বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে?

একটু পরেই লোক দুটো পাকা রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। সেখান দিয়ে গাড়ি চলে না। কর্নেলসাহেবও গাড়ি থেকে নেমে শুরু করলেন দৌড়তে। অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যায় না। তোক দুটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আকাশে আর একবার বিদ্যুতের ঝিলিক। একসঙ্গে একশোটা বজ্রপাতের মতন প্রচণ্ড শব্দ। সেই শব্দে ওরা একসঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

অন্যরা মাটিতে মুখ চেপে রেখেছিল, সুজয় শুধু ওপরের দিকে তাকাল। সে দেখল, অন্ধকার আকাশের বুক চিরে একটা রকেট চলে যাচ্ছে। ওরা এবার সত্যিই চলে গেল।

সুজয় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই উজ্জ্বল রকেটটার দিকে। সেই রকেটটা কিন্তু খবরের কাগজের ছবিতে দেখা আমেরিকা বা রাশিয়ার ছুঁচলো রকেটের মতন নয়। বরং মহাভারত বইয়ের ছবিতে দেখা রথের মতন অনেকটা।